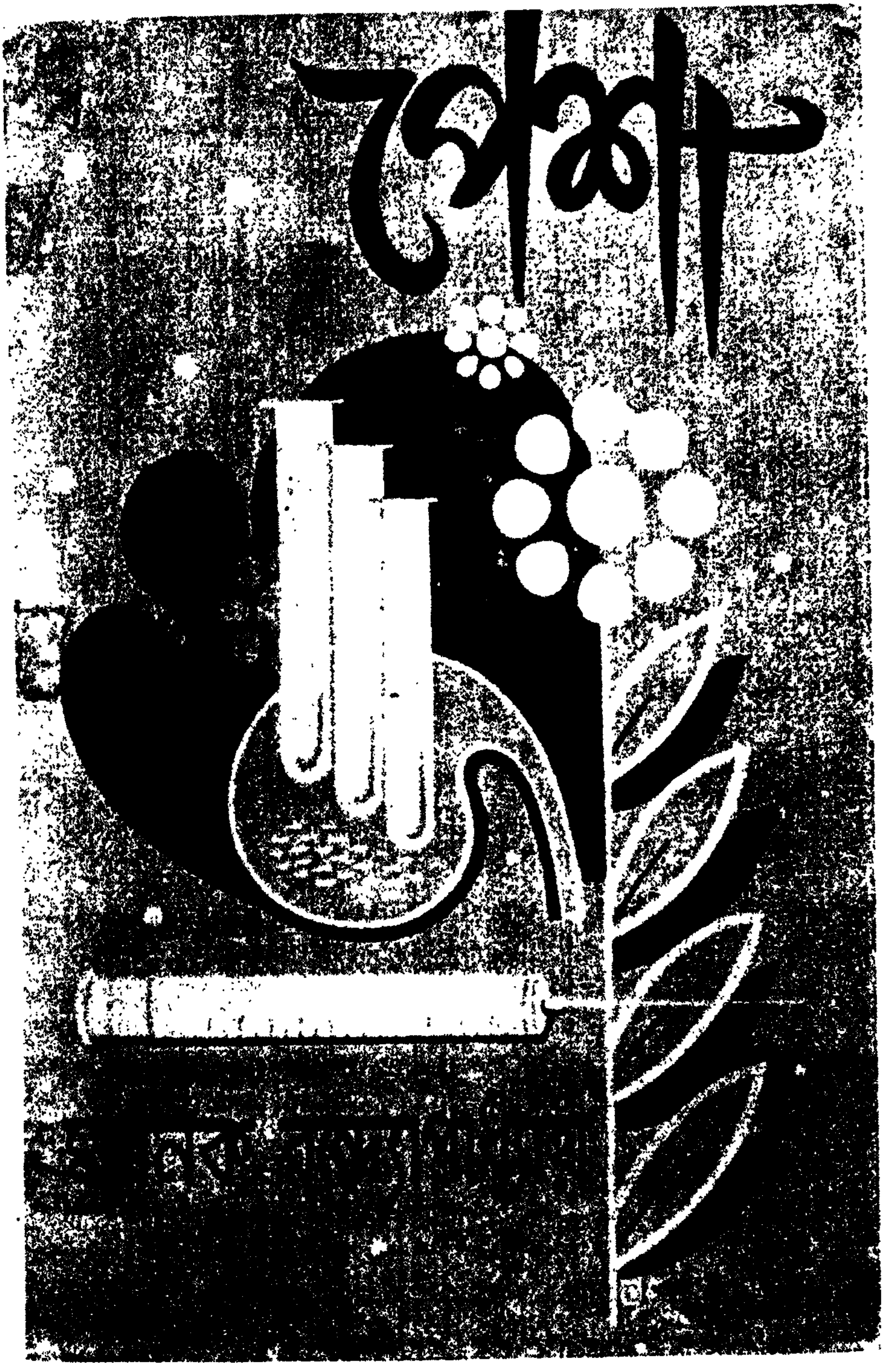


পেশা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

১

কেদার আজ পাসের খবর জানতে যাবে।

প্রকাশ্যভাবে সকলের পাস-ফেলের খবর প্রকাশ হতে এখনও কয়েকদিন দেরি আছে। তলে তলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব হওয়ায় খবরটা আগেই জানার ব্যবস্থা হয়েছে।

বাড়ির লোকের কথা আলাদা। তারা ব্যাকুল হবেই। একদিন আগে পাসের খবর সুনিশ্চিত জেনে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারাটাও তাদের কাছে সামান্য কথা নয়। নিজের আগ্রহ ব্যাকুলতাই অত্যন্ত অনুচিত মনে হয় কেদারের।

পাস করে যে ডাক্তার হবে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের রোগ সারাবার মৃত্যু ঠেকাবার দায়িত্ব পাবে, জানা কথা জানতে কী তার এমন অধীর হওয়া সাজে ?

পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। সহজ বুদ্ধিতেই সে জানে যে কল্পনাতীত কোনো অঘটন না ঘটলে তার ভালোভাবে পাস না করার কোনোই কারণ নেই। তবু শুধু এই পাসের খবরটা জানার জন্য সেও যেন বাড়ির লোকের  সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাকুল হয়েছে মনে হয়।

এ যেন গেঁয়ো লোকের চেক পাওয়া। জানে চেক ভাঙিয়ে টাকা পাওয়া যাবে তবু নগদ টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকা।

পাস করে ডাক্তার হবে কেদার।

ডাক্তার হওয়ার সাধ তার ছেলেবেলার স্বপ্ন।

রহস্যলোকের রহস্যময় লোক ছিল ডাক্তাররা তার কাছে, রূপকথার যাদুকরদের জীবন্ত বাস্তব সংস্করণ। রোগ হয়ে মানুষ মরে, ছোটোবড়ো সব মানুষ, তাদের বাড়িতেও অন্যলোকের বাড়িতেও। রোগ হয়েও মানুষ বাঁচে, ডাক্তার রোগীকে বাঁচায়, কিন্তু ডাক্তার দেখাবার মতো রোগ হলেই মরণের আকাশপাতাল জোড়া ভয়ংকর রহস্য ঘনিয়ে আসে বাড়িতে। ডাক্তার লড়াই করে তার সঙ্গে, কাটিয়ে দেয় সেই যাদু, বাড়ি থেকে উপে যায় দম আটকানো ভয় ভাবনা বিষাদের বিশ্রী আবহাওয়া।

ভূতের ভয়ে না নড়ে চড়ে জেগে থাকার মতো ওই আবহাওয়া বাড়িতে আসে আগে, রোগের সঙ্গে আসে। তারপর আবির্ভাব ঘটে ডাক্তারের, কালো ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ হাতে নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আবহাওয়ায় অদ্ভুতরকম পরিবর্তন ঘটে যায়।

হাতের কাজ স্থগিত হয়, ফিসফিসানি কথা থেমে যায়, সকলের উদ্‌বেগ আর আতঙ্ক যেন রূপান্তরিত হয় প্রত্যাশায়। স্পষ্ট টের পাওয়া যায় রোগীর দিক থেকে সকলের মনের কাঁটা যেন চুম্বকের টানে ঘুরে গিয়েছে ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারের উপর গুরুজনদের অসীম ভয়ভক্তি, শিশুর মতো নির্ভরতা, মুখের কথা খসতে না খসতে ব্যস্ত হয়ে ডাক্তারের আদেশ পালন করা আর সারা বাড়ি জুড়ে গম্ভীর থমথমে ভাব—সমস্ত মিলে কেদারকে অভিভূত করে রাখত।

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল তার ডাক্তারকে জগতে সেরা জীব মনে করার আসল কারণ।

বাড়িতে ডাক্তার আসার কারণ ও সম্ভাবনা ঘটলে কিশোর বয়সেও সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎকণ্ঠার তার সীমা থাকেনি পাছে কোনো কারণে ডাক্তারের আসা বাতিল হয়ে যায়।

রোগীর জন্য মমতা নিয়ে সে পড়ে যেত বিষম মুশকিলে।

অসুখ যদি কম হয়, রোগী যদি এমনিই সেরে উঠবে বোঝা যায়, তবে তো আর ডাক্তারের পদার্পণ ঘটবে না বাড়িতে। অথচ যাকে ভালোবাসে, অসুখটা তার সেরে না গিয়ে কঠিন হয়ে যাক এ কামনাই বা সে করে কী করে।

বাড়িতে ডাক্তারের পদার্পণ ঘটুক কামনা করাই অশুভ।

তাই একটা বোঝাপড়া দরকার হত।

অসুখ যেন সেরে যায়, নিশ্চয় সেরে যায়, ডাক্তার এসে চিকিৎসা আরম্ভ করা মাত্র সেরে যায়। অসুখ সারবে বইকী। নিশ্চয় সারবে। তবে ডাক্তার এসে অসুখটা সারিয়ে দিক এমনি যেন না সারে, না কমে—ডাক্তারের আসা যেন বাতিল না হয়ে যায়।

বাস্। শুধু এইটুকু সে চায়।

অসুখ হোক। ডাক্তার ডাকতে হোক। ডাক্তার আসুক। অসুখ সেরে যাক

প্রমাণ হোক যে ভগবান নয়, অসুখ সারিয়ে মানুষকে প্রাণ দেয় ডাক্তার।

ছেলেবেলাতেও সে অনেকবার দেখেছে, ডাক্তার এলেও অসুখ সারেনি রোগী মারা গেছে। এই বাড়িতেই মরেছে তার ঠাকুরদা, পিসিমা, বড়োদিদি, ছোটো দুটি ভাইবোন, চারজন আত্মীয় আশ্রিত। যাদের ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যই তাদের শহরের এই বাড়িতে আনা হয়েছিল।

পাড়ার অনেক বাড়িতে ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মরেছে তার চেনা পরিবারের চেনা লোক—সংখ্যা তাদের কম নয়।

বাড়িতে চিঠি এসেছে শোক আর আপশোশ বহন করে, দূরের নিকট মানুষের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে—যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছিল, বড়ো ডাক্তার সকলকেই দেখানো হইয়াছে কিন্তু –।

কিন্তু যতই মনে আসুক, এ সব ব্যর্থতা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, ডাক্তারদের ছোটো করে দিতে পারেনি তার কাছে।

বরং এ সব মরণই তার কাছে ডাক্তারদের করে তুলেছে অমানুষিক প্রতিভার প্রতীক—নিয়তির মতো এ রকম অনিবার্য মরণকে পর্যন্ত যারা ঠেকাতে চায়, ঠেকাতেও পারে।

অসুখে মরেছে অনেকে- কিন্তু তার চেয়ে কত বেশি লোক অসুখে মরেনি এই ডাক্তারদের জন্য ?

সে নিজে ? জ্বরে, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়, ফোঁড়ায়, হাত ভেঙে কষ্ট পেয়েছে, টাইফয়েড হয়ে কয়েকদিনের জন্য মরে গিয়েছিল।

ডাক্তার তার কষ্ট কমিয়েছে, তাকে বাঁচিয়েছে, পাড়ার হর্ষ ডাক্তার।

পরীক্ষা দেবার আগে অসম্ভব অমানুষিক খাটুনি খাটতে খাটতে অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে। প্র্যাকটিস ইন মেডিসিনের ভল্যুমগুলি দিয়ে চতুর্দোলা বানিয়ে কেদার ডাক্তারকে সসম্মানে তাতে চড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজার চেয়ে বড়ো ডাক্তার পালের মেয়ে গীতার অসুখ সারাবার জন্য, রাজা ডাক্তার পাল আর রাণীসুন্দরী কেঁদে বলছে, মেয়েকে বাঁচাও, মেয়ে আর আমাদের ডাক্তারি সম্মান ও পশারের অর্ধেক তোমায় দেব।

সকাল থেকে বাড়িতে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। পরিবারের প্রথম ছেলে প্রথম আশা প্রথম ভরসা কেদার। সে পাস করে ডাক্তার হয়ে পসার করলে সকলের অবস্থাই বদলে যাবে নিশ্চয়।

শুভময়ী ঘুম ভেঙে ছেলের কল্যাণের জন্য দেবদেবীর নাম স্মরণ করে চলেছে। মানত করা হয়ে আছে অনেক আগেই, কেদারের যখন পরীক্ষা শুরু হয়।

পাস করে আমায় কী এনে দিবি ?

তুমি কী চাও ?

তুই যা চাস আমি তাই চাই। একটা বউ এনে দিবি আমায় !

প্রমথ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। ধৈর্য ও স্থৈর্য বজার রাখার চেষ্টায় এটা এসেছে। শুধু হাত দুটি তার মাঝে মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে খবরের কাগজ ধরে থাকতে।

ছোটো ভাই উপেন ভালো ছেলে, পাস দিতে ওস্তাদ। ঘনায়মান পরীক্ষা-সংকটের দিনেও সে স্কলারশিপ নিয়ে কলেজের প্রথম ধাপ ডিঙিয়েছে।

তার মৃদু একটু অবজ্ঞা ও প্রত্যাশার মিশ্রিত ভাব। তার মতো ভালো করে পরীক্ষা পাসের সাধ্য দাদার নেই, তবে কেদারের পাস করে ডাক্তার হওয়াটা দরকার। প্রমথ সামলাতে পারছে না, পড়াশোনার উঁচুস্তরে উঠতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে দাদার সাহায্য দরকার হবে।

অমলা বড়ো বকে। তার মুখের যেন আজ কামাই নেই। দাদা তার পাস করবে এটা ধরে নিয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বকে চলেছে বলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে কারও প্রাণ সরছে না, যদিও এত বড়ো ধেড়ে মেয়ের এত বেশি বকাটাই এক ধরনের বজ্জাতি।

দোতলার ভাড়াটে জনার্দন অকারণেই উপর থেকে ডাক দিয়ে জেনে নিয়েছে, কেদার আজ যাচ্ছে কিনা। কথাটা তার জানা। কাল সন্ধ্যায় কেদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বহুক্ষণ একটানা আলোচনা চালাবার সময় প্রমথ অনেকবার তাকে জানিয়েছিল।

তাছাড়া একতলায় কী ঘটছে না ঘটছে কিছুই গোপন থাকে না দোতলায়। নেহাত ফিসফিস করে কথা না বললে নীচের তলার কথাবার্তা উপর থেকে সবই প্রায় শোনা যায়।

তার মেয়ে মায়া একবার ঘুরে গিয়েছে নীচের তলা থেকে। বিয়ের যোগ্য পাস করা ছেলেদের বিরুদ্ধে তার একটা নালিশ সমগ্রভাবে ঘনীভূত হচ্ছে দিন কেটে যাওয়ার সঙ্গে। কিন্তু কেদারের পাস-ফেলে তার কিছু আসে যায় না।

পাস করলে আমায় কী দেবেন কেদারদা ?

তোমায় ? একটা চশমা দেব—কালো বর এলে ফরসা দেখাবে। পরিমল কী করছে ?

দাদা রোগী দেখতে বেরোবে।

জনার্দনের বড়ো ছেলে সম্প্রতি কবিরাজ হয়েছে। গলির মোড়ের কাছে ছোটো একটি ঘরে ওষুধের ছোটোখাটো দোকান খুলে বসেছে। দু-চারপয়সা কামাতে শুরু করেছে রোগী দেখে এবং ওষুধ বিক্রি করে, তবু এখনও এ পেশা নিতে হওয়ায় তার মনে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে নিদারুণ।

বাপের সঙ্গে অনেক লড়াই করে তবে সে হার মেনেছিল। কেদার হতে চলেছে ডাক্তার, তাকে হতে হবে কবিরাজ ! কেদার একদিন মোটরে চেপে রোগী দেখবে, কাজে লাগাবে হরেক রকম সহজ আর জটিল যন্ত্রপাতি, আলোয় ঝলমল সাজানো ডিসপেনসারিতে বসবে রাজা হয়ে, আর সে কিনা ছোটো একটা ঘুপচি ঘরে কয়েকটা আরক জারক বড়ি সম্বল করে পুঁথি ঘাঁটবে খল নাড়বে আর শুধু আঙুল দিয়ে টিপে দেখবে নাড়ি।

তার মনে হয়েছিল, কেদার এগিয়ে চলেছে যুগের সঙ্গে আর সে পিছনে চলতে শুরু করেছে শত শত বছর আগেকার জীবনের দিকে।

বেরিয়ে যাবার সময় কেদারের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করেই পরিমল নীরবে রাস্তায় নেমে যায়।

কেদারও চুপ করে থাকে। পরিমলের মনের ভাব সে খুব ভালো করেই জানে।

বাড়িতে ডাক্তার আসার কারণ ও সম্ভাবনা ঘটলে কিশোর বয়সেও সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎকণ্ঠার তার সীমা থাকেনি পাছে কোনো কারণে ডাক্তারের আসা বাতিল হয়ে যায়।

রোগীর জন্য মমতা নিয়ে সে পড়ে যেত বিষম মুশকিলে।

অসুখ যদি কম হয়, রোগী যদি এমনিই সেরে উঠবে বোঝা যায়, তবে তো আর ডাক্তারের পদার্পণ ঘটবে না বাড়িতে। অথচ যাকে ভালোবাসে, অসুখটা তার সেরে না গিয়ে কঠিন হয়ে যাক এ কামনাই বা সে করে কী করে।

বাড়িতে ডাক্তারের পদার্পণ ঘটুক কামনা করাই অশুভ।

তাই একটা বোঝাপড়া দরকার হত।

অসুখ যেন সেরে যায়, নিশ্চয় সেরে যায়, ডাক্তার এসে চিকিৎসা আরম্ভ করা মাত্র সেরে যায়। অসুখ সারবে বইকী। নিশ্চয় সারবে। তবে ডাক্তার এসে অসুখটা সারিয়ে দিক, এমনি যেন না সারে, না কমে—ডাক্তারের আসা যেন বাতিল না হয়ে যায়।

বাস্। শুধু এইটুকু সে চায়।

অসুখ হোক। ডাক্তার ডাকতে হোক। ডাক্তার আসুক। অসুখ সেরে যাক।

প্রমাণ হোক যে ভগবান নয়, অসুখ সারিয়ে মানুষকে প্রাণ দেয় ডাক্তার।

ছেলেবেলাতেও সে অনেকবার দেখেছে, ডাক্তার এলেও অসুখ সারেনি রোগী মারা গেছে। এই বাড়িতেই মরেছে তার ঠাকুরদা, পিসিমা, বড়োদিদি, ছোটো দুটি ভাইবোন, চারজন আত্মীয় আত্মীয়া যাদের ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাবার জন্যই তাদের শহরের এই বাড়িতে আনা হয়েছিল

পাড়ার অনেক বাড়িতে ডাক্তারের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মরেছে তার চেনা পরিবারের চেনা লোক—সংখ্যা তাদের কম নয়।

বাড়িতে চিঠি এসেছে শোক আর আপশোশ বহন করে, দূরের নিকট মানুষের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে—যথাযথ চিকিৎসা হইয়াছিল, বড়ো ডাক্তার সকলকেই দেখানো হইয়াছে কিন্তু ।

কিন্তু যতই মনে আসুক, এ সব ব্যর্থতা, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ডাক্তারদের ছোটো করে দিতে পারেনি তার কাছে।

বরং এ সব মরণই তার কাছে ডাক্তারদের করে তুলেছে অমানুষিক প্রতিভার প্রতীক নিয়তির মতো এ রকম অনিবার্য মরণকে পর্যন্ত যারা ঠেকাতে চায়, ঠেকাতেও পারে।

অসুখে মরেছে অনেকে- কিন্তু তার চেয়ে কত বেশি লোক অসুখে মরেনি এই ডাক্তারদের জন্য ?

সে নিজে ? জ্বরে, পেটের অসহ্য যন্ত্রণায়, ফোঁড়ায়, হাত ভেঙে কষ্ট পেয়েছে টাইফয়েড হয়ে কয়েকদিনের জন্য মরে গিয়েছিল।

ডাক্তার তার কষ্ট কমিয়েছে, তাকে বাঁচিয়েছে, পাড়ার হর্ষ ডাক্তার।

পরীক্ষা দেবার আগে অসম্ভব অমানুষিক খাটুনি খাটতে খাটতে অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে ভাঙা ভাঙা ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে। প্র্যাকটিস ইন মেডিসিনের ভল্যুমগুলি দিয়ে চতুর্দোলা বানিয়ে কেদার ডাক্তারকে সসম্মানে তাতে চড়িয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজার চেয়ে বড়ো ডাক্তার পালের মেয়ে গীতার অসুখ সারাবার জন্য, রাজা ডাক্তার পাল আর রাণীসুন্দরী কেঁদে বলছে, মেয়েকে বাঁচাও, মেয়ে আর আমাদের ডাক্তারি সম্মান ও পশারের অর্ধেক তোমায় দেব।

সকাল থেকে বাড়িতে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। পরিবারের প্রথম ছেলে প্রথম আশা প্রথম ভরসা কেদার। সে পাস করে ডাক্তার হয়ে পসার করলে সকলের অবস্থাই বদলে যাবে নিশ্চয়।

শুভময়ী ঘুম ভেঙে ছেলের কল্যাণের জন্য দেবদেবীর নাম স্মরণ করে চলেছে। মানত করা হয়ে আছে অনেক আগেই, কেদাবের যখন পরীক্ষা শুরু হয়।

পাস করে আমায় কী এনে দিবি ?

তুমি কী চাও ?

তুই যা চাস আমি তাই চাই। একটা বউ এনে দিবি আমায় !

প্রমথ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। ধৈর্য ও স্থৈর্য বজার রাখার চেষ্টায় এটা এসেছে। শুধু হাত দুটি তার মাঝে মাঝে একটু কেঁপে যাচ্ছে খবরের কাগজ ধরে থাকতে।

ছোটো ভাই উপেন ভালো ছেলে, পাস দিতে ওস্তাদ। ঘনায়মান পরীক্ষা-সংকটের দিনেও সে স্কলারশিপ নিয়ে কলেজের প্রথম ধাপ ডিঙিয়েছে।

তার মৃদু একটু অবজ্ঞা ও প্রত্যাশার মিশ্রিত ভাব। তার মতো ভালো করে পবীক্ষা পাসের সাধ্য দাদার নেই, তবে কেদারের পাস করে ডাক্তার হওয়াটা দরকার। প্রমথ সামলাতে পারছে না, পড়াশোনার উঁচুস্তরে উঠতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে দাদার সাহায্য দরকাব হবে।

অমলা বড়ো বকে। তার মুখের যেন আজ কামাই নেই। দাদা তার পাস করবে এটা ধরে নিয়েই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বকে চলেছে বলে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিতে কারও প্রাণ সরছে না, যদিও এত বড়ো ধেড়ে মেয়ের এত বেশি বকাটাই এক ধবনের বজ্জাতি।

...াব ভাড়াটে জনার্দন অকারণেই উপর থেকে ডাক দিয়ে জেনে নিয়েছে, কেদার আজ যাচ্ছে কিনা। কথাটা তার জানা। কাল সন্ধ্যায় কেদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে বহুক্ষণ একটানা আলোচনা চালাবার সময় প্রমথ অনেকবার তাকে জানিয়েছিল।

তাছাড়া একতলায় কী ঘটছে না ঘটছে কিছুই গোপন থাকে না দোতলায়। নেহাত ফিসফিস করে কথা না বললে নীচের তলার কথাবার্তা উপর থেকে সবই প্রায় শোনা যায়।

তার মেয়ে মায়া একবার ঘুরে গিয়েছে নীচের তলা থেকে। বিয়েব যোগ্য পাস করা ছেলেদের বিরুদ্ধে তার একটা নালিশ সমগ্রভাবে ঘনীভূত হচ্ছে দিন কেটে যাওয়াব সঙ্গে। কিন্তু কেদারেব পাস-ফেলে তার কিছু আসে যায় না।

পাস করলে আমায় কী দেবেন কেদারদা ?

তোমায ? একটা চশমা দেব—কালো বর এলে ফরসা দেখাবে। পরিমল কী করছে ?

দাদা রোগী দেখতে বেরোবে।

জনার্দনের বড়ো ছেলে সম্প্রতি কবিরাজ হয়েছে। গলির মোড়ের কাছে ছোটো একটি ঘরে ওষুধের ছোটোখাটো দোকান খুলে বসেছে। দু-চারপয়সা কামাতে শুরু করেছে রোগী দেখে এবং ওষুধ বিক্রি করে, তবু এখনও এ পেশা নিতে হওয়ায় তার মনে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে নিদারুণ।

বাপের সঙ্গে অনেক লড়াই করে তবে সে হার মেনেছিল। কেদার হতে চলেছে ডাক্তার, তাকে হতে হবে কবিরাজ ! কেদার একদিন মোটরে চেপে রোগী দেখবে, কাজে লাগাবে হরেক রকম সহজ আর জটিল যন্ত্রপাতি, আলোয় ঝলমল সাজানো ডিসপেনসারিতে বসবে রাজা হয়ে, আর সে কিনা ছোটো একটা ঘুপচি ঘরে কয়েকটা আরক জারক বড়ি সম্বল করে পুঁথি ঘাঁটবে খল নাড়বে আর শুধু আঙুল দিয়ে টিপে দেখবে নাড়ি।

তার মনে হয়েছিল, কেদার এগিয়ে চলেছে যুগের সঙ্গে আর সে পিছনে চলতে শুরু করেছে শত শত বছর আগেকার জীবনের দিকে।

বেরিয়ে যাবার সময় কেদারের সঙ্গে তার দেখা হয়। শুধু একটু হাসবার চেষ্টা করেই পরিমল নীরবে রাস্তায় নেমে যায়।

কেদারও চুপ করে থাকে। পরিমলের মনের ভাব সে খুব ভালো করেই জানে।

প্রমথ তাগিদ জানায়, দেরি করিসনে কেদার। ডাক্তার সান্যাল বেরিয়ে গেলে আবার মুশকিল হবে।

এই যে যাই।

আজ তাকে দ্বিতীয় দফায় আরেকবার চা দেওয়া হয়েছে। বেশি গরম চা মুখে নিয়ে ফেলায় কেদারের চোখে জল এসে পড়ে।

কেন মিছে তাগিদ দেওয়া তাকে ? তার কী গরজ নেই !

জামা-কাপড় পরে সে তৈরি হলে শুভময়ী তার কপালে শুকনো বিবর্ণ দুটি ফুলপাতা ছুঁইয়ে দেয়। অনেক দূরের তীর্থ থেকে অনেকদিন আগে এ জিনিসটি আনা হয়েছিল, ন্যাকড়ায় বেঁধে তোরঙ্গে একেবারে গয়নার বাকসের মধ্যে সযত্নে তুলে রাখা হয়।

উত্তেজনায় শুভময়ীর মুখের এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটেছে যে চেয়ে দেখে কেদারের মনে হয়, মার শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই।

প্রণাম নেবার জন্য প্রমথও শুভময়ীর পাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনকে প্রণাম করে কেদার বেরিয়ে যায়।

ডাক্তার সান্যাল বলে, তুমি ফাঁকিবাজ ছেলে কেদার।

শুনে বুকটা ধড়াস করে ওঠে কেদারের। হিসাব তবে তার ভুল হয়েছে ? পরীক্ষার ব্যাপার, কে জানে কোথায় কী গোলমাল হয়ে গেছে !

সান্যাল বলে, আগে থেকে একটু তদ্‌বির করতে পারলে না?

কেদার ম্লান মুখে বলে, তদ্‌বির করে আর কী হবে স্যার ? ও ভাবে পাস করতে চাই না। কীসে ফেল করলাম ?

সান্যাল হেসে বলে, আরে না, ফেল করবে কেন। সে কথা বলিনি। ফেল কি হে, তুমি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ ! তাই বলছিলাম একটু তদ্‌বির করলে খুব ভালো পজিশন বাগিয়ে নিতে পারতে। আমাকেও যদি জানাতে আগে যে ডাক্তার পাল তোমার জন্য স্পেশাল ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন—

কেদারের যেন জ্বর ছাড়ে। পাস তাহলে সে করেছে ভালোভাবেই ! তদ্‌বিরের অভাবে যা ফসকে গিয়েছে সে জন্য সে কিছুমাত্র আপশোশ বোধ করে না।

খবর জানতে সময় লাগে সামান্যই। কিন্তু সোজা বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না কেদার। আরেকজন উন্মুখ হয়ে আছে খবরটা শুনবার জন্য।

গীতাকে খবর জানাবার জন্য তাকে রওনা দিতে হয় শহরের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে।

ট্রামে এত লোকের মধ্যে, লেডিজ সিটে চোখ টেনে নেবার মতো অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি বসে থাকলেও, সে যেন আজ শুধু দেখতে পায় মিকশ্চারের শিশি হাতে শীর্ণ বিবর্ণ বউটিকে আর তার পাসের শার্ট পরা রোগা মানুষটার কোলে একটা জীবন্ত কঙ্কালের মতো ছেলেটাকে।

কেদার জানে বউটির হাতের শিশির ওষুধটা তার নিজের জন্য, ওর মুখের সুস্পষ্ট জ্বরের ছাপ দেখেই তা বোঝা যায়। ছেলেটারও চিকিৎসা দরকার কিন্তু সেটা সাধারণ ওষুধপত্রের চিকিৎসা, দুদিন পরে হলেও চলবে, না হলেই বা উপায় কী !

বাড়িতে ডাক্তার ডাকার ক্ষমতা নেই, জ্বর গায়ে বউটিকে তাই বিছানা ছেড়ে যেতে হয়েছে চিকিৎসকের কাছে।

হাসপাতালে কেন যায়নি কেদার জানে।

হাসপাতালে রোগ পরীক্ষার জন্য যতক্ষণ বসে থাকতে হবে, জ্বর গায়ে ততক্ষণ বসে থাকাব সাধ্য বউটির নেই।

তার কাছেও একদিন এ রকম রোগী আসবে, বাড়িতে ডেকে তাকে ফি দেবার সাধ্য যার নেই। রোগীকে সে পরীক্ষা করবে, বিধান দেবে ওষুধ ও পথ্যের, বলে দেবে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয় কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে পাঁচ মিনিটের জন্যও বিছানা ছেড়ে ওঠা উচিত নয় এ রোগীর পক্ষে !

উচিত তো নয়, কিন্তু সেও তো বিনা ফি-তে বাড়ি গিয়ে দেখবে না ওই রোগীকে। তাকে দর্শনী দিতে হলে ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না—বাড়িতে ডেকে তাকে দেখানোর কোনো অর্থ থাকে না।

ডাঃ পালের বাড়িটা পৈতৃক নয় তার নিজের পয়সা ও রুচি অনুসারে তৈরি। তৈরি হবার পর বাড়িটার অনেক বদল হয়েছে এবং নতুনত্ব ঘটেছে বোঝা যায়। সেগুলি ইঙ্গিত করে তার পয়সা বাড়বার এবং প্রথম বয়সের রুচিগত আধুনিক সূক্ষ্মতা ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসার।

খবর শুনে গীতা খুশি হয়ে বলে, দেখলে তো ? একটা আদর্শ ছাড়া কিছু হয় না মানুষের! বাজে ছাত্র ছিলে, ভালো পাস করলে কার জন্য ?

খাইয়ে দিতে হবে না কি ? কী খাবে ?

ছুটকো খাওয়া খাইনে আমি। রোজ খাওয়ার বাকি ব্যবস্থাটা করে ফ্যালো এবার।

গীতা হাসে।—তবে তুমি দুটো একটা খেতে পার। শুধু আজ, খবরটা এনেছ বলে !

গীতার মুখের কোমল মসৃণ ত্বক আজ এই বিশেষ দিনেও আড়াল করে দিতে পারে না ট্রামের সেই রুগ্ণ বউটির জ্বরতপ্ত মুখখানা।

বিশেষ দিন বলেই বোধ হয়।

এত কাছে গীতার মুখ কিন্তু মনে ভেসে আসে সেই রুগ্ণা রমণীর মুখখানা। গীতাকে চিরদিনের জন্য ঘরে রেখে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হলে ওদের কথা ভাবলে চলবে না, ওই সব রোগিনী জ্বর-গায়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তার কাছে এলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার উদারতা দিয়ে হবে না। গোড়াতেই না হোক, লক্ষ্য তাকে রাখতে হবে ডাক্তার পালের স্তরে উঠতে, আরও উঁচুতে যদি নাও উঠতে পারে। এতই বাড়াতে হবে তার চিকিৎসার দাম যে অবস্থাপন্ন লোকেরাও নেহাত দায়ে না ঠেকলে বাড়িতে ডাকবে না, অর্ধেক ফি দিয়ে কাজ সারবার জন্য তারই বাড়িতে এসে ভিড় করবে।

আজ পাসের খবর জেনে এসে গীতার এত কাছে বসেও প্রথম খটকা লাগে কেদারের, সে কি পারবে ? যে সব বিশেষ গুণ দরকার হয় ডাক্তার পালের মতো বড়ো ডাক্তার হতে হলে, সে গুণগুলি তার কি সব আছে ?

সকলের আগে দরকার হবে যে মানসিক গঠন ?

বাবাকে জানিয়ে যেয়ো। একটু বোসো।

গীতার এই ইচ্ছাকে সম্মান দিতে গিয়েই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় কেদারের। ডাক্তার পাল জরুরি কলে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে খবর শুনে বলে, বাঃ উদ্যোগীরাই পুরুষসিংহ সন্দেহ কী !

গীতা বলে, কিন্তু বাবা আসল উদ্যোগটা কার ?

তোমার ! পুরুষের আবার নিজের উদ্যোগ থাকে নাকি ? মেয়েরাই সব, মেয়েদের জন্যই সব !

হাসিটা হাসিই হয় ডাক্তার পালের কিন্তু এই সকাল বেলা তার মুখের শ্রান্তভাবটাও কেদার লক্ষ করেছে। এখনও প্রায় সারাটা দিন রোগী দেখা বাকি !

এদিকে বেলা বাড়ে, শুভময়ীর অস্বস্তি আর উত্তেজনাও বাড়ে। দুঘণ্টার মধ্যে কেদারের ফিরবার কথা। সাড়ে সাতটার সময় সে বেরিয়েছে, বাড়ি ফিরতে তার সাড়ে নটা বড়ো জোর দশটা হওয়া উচিত। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে শুভময়ীর মনে হতে থাকে, বড়ো দেরি করছে কেদার।

প্রমথ বলে, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? কতরকম কারণ ঘটতে পারে। ঘড়ির কাঁটায় কী কাজ হয় ?

কিন্তু ভিতর থেকে যার নিদারুণ কষ্টকর অস্বস্তি চাপ দিচ্ছে, সে কী যুক্তি মেনে শান্ত হতে পারে ! বারবার সে প্রশ্ন করে, কটা বাজল ? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কেমন এক বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়।

তবে কি খারাপ খবর ? না, বিপদ-আপদ ঘটল কিছু ?

প্রমথ আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিল। আপিসে লেট হয়ে গেলেই বা উপায় কী। খবরটা না জেনে সে তো আজ বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারবে না কিছুতেই ! আজকালকার ছেলেদের সত্যি কাণ্ডজ্ঞান নেই।

ঘামে গরমে দুশ্চিন্তায় শুভময়ীর মুখ যা হয়েছে দেখে তার অস্বস্তি শতগুণে বেড়ে যায়।

বারবার সে ভরসা দিয়ে বলে, আসবে, আসবে। এখুনি আসবে। হয়তো কোথাও দেরি করছে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছে—

তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো বরং।

দেখি, আরেকটু দেখি। এমনি লেট হয়ে গেছে, আমি এদিকে বেরোই ওকে খুঁজতে, ও এদিকে বাড়ি ফিরুক। অত ব্যস্ত হয়ো না। আরেকটু দেখি।

খানিক পরেই শুভময়ী অসুস্থ হয়ে পড়ল। সত্যসত্যই পড়ল। রান্নাঘরের ভেতর থেকে আরও একবার এসে দাঁড়িয়েছে সামনের ছোটো রোয়াকটুকুতে, লোহার হাতাটি পর্যন্ত হাতে ধরা আছে।

হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই হাঁটু মুচড়ে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দেখা গেল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। শ্বাস বইছে আস্তে, আলগাভাবে। তাও যেন খুব কষ্টে।

হইহই ছুটোছুটি কান্নাকাটি পড়ে যায়। উপরতলার সকলে নেমে আসে। কলসি কলসি জল ঢালা হতে থাকে শুভময়ীর মাথায়। উপেন ছুটে যায় গলির মোড়ের সুধা ভান্ডার ডিসপেনসারির হর্ষ ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

সুস্থ সবল জ্যান্ত মানুষটার এ কী হল ? বছর খানেকের মধ্যে কোনো কঠিন অসুখ দূরে থাক একদিন একটু গা গরম পর্যন্ত হয়নি। এমনি মাথা ঘোরে, শরীর অস্থির অস্থির করে—তা, সংসারের এত খাটুনি খাটলে মেয়েদের ও রকম করেই থাকে।

মেয়েরা ঘিরে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করে নানারকম।

মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

দুবেলা উনানের আঁচ।

বাইরেটাই দেখতে পোস্ট, ভেতরে কী আছে কিছু ?

হর্ষ ডাক্তার এসে পৌঁছোবার মিনিটখানেক আগে কেদার বাড়ি ফিরল। মুখে তার ছিল আনন্দের জ্যোতি, ব্যাপার দেখে তা মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

শুভময়ীর নাড়ি পরীক্ষা করে একেবারে পাংশু হয়ে গেল তার মুখ। ইতিমধ্যেই এসে পড়ল ব্যাগ হাতে ঢিলে কোট আর আঁটো প্যান্ট পরা হর্ষ ডাক্তার। রোগিণীকে দেখে মুখখানা তারও একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

পরীক্ষা করতে করতে হর্ষ জিজ্ঞাসা করে, ব্লাডপ্রেসার আগে কখনও নেওয়া হয়নি ?

কেদার জবাব দেয়, না।

হর্ষ ব্লাডপ্রেসার নেওয়ার ব্যবস্থা করে। হর্ষ ডাক্তার যখন রক্তের চাপ মাপবার যন্ত্রটির ছোটো পাম্পটি টিপতে থাকে কেদারের চোখ দুটি বড়ো বড়ো হয়ে যেন বেরিয়ে আসবার উপক্রম করে।

হর্ষ যেন শূন্যকে সম্বোধন করে বলে, এই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে এই গরমে উনি উনানের আঁচে রাঁধতে গিয়েছিলেন ?

কেদার স্তব্ধ হয়ে থাকে।

প্রমথ ভয়ে ভয়ে বলে, আমরা তো জানতাম না !

দুজন বড়ো ডাক্তারের নাম করে তাদের মধ্যে যাকে হোক একজনকে অবিলম্বে আনাবার প্রয়োজন জানিয়ে হর্ষ অন্যান্য ব্যবস্থা করার দিকে মন দেয়।

উপেন যায় অন্য ডাক্তার আনতে, কেদার নীরবে হর্ষ ডাক্তারের হুকুম পালন করে।

প্রায় যন্ত্রের মতো।

মাথাটা যেন সত্যই তার ভোঁতা হয়ে গেছে। তারা জানত না। কেন জানত না ? অন্য কেউ না জানুক, সে কেন জানেনি ? কেন জানবার প্রয়োজনও বোধ করেনি ? মায়ের তার কোনো প্রকাশ্য উগ্র রোগ হয়নি দু-একবছরেব মধ্যে, কিন্তু ভেতরের এই মারাত্মক রোগের কত লক্ষণ তো তার চোখের সামনে অবিরাম প্রকাশ পেয়ে এসেছে ? মায়ের এই পরিণামের ছোটো ছোটো অভ্রান্ত চিহ্নগুলি একে একে কেদারের মনে পড়ে যেতে থাকে। ও সব লক্ষণের যে কোনো একটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু কখনও সে তো খেয়ালও করেনি !

ও সব চিহ্ন যেন শুভময়ীর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক, বেখাপ্পা কিছু নয়। মায়েরা ও রকম করেই থাকে, মায়েদের মন মেজাজের ও রকম খাপছাড়া ভাব হয়। বিছানায় যতক্ষণ না পড়ে নির্দিষ্ট স্পষ্ট চোখে আঙুল দেওয়া রোগ হয়ে, ততক্ষণ মায়ের আবার রোগ কীসের ?

চিকিৎসা চলে শুভময়ীর।

তারই এক ফাঁকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করে, খবরটা জেনেছিস ?

খবর ?

কিছুক্ষণ মানেই বুঝতে পারে না কেদার।

যা জানতে বেরিয়েছিলি ?

পরীক্ষা শব্দটা উচ্চারণ করতে ভয় হয় প্রমথের।

জেনেছি। পাস করেছি।

রেজাল্ট কেমন হয়েছে কিছু—?

ভালো হয়েছে।

মুখে বলে ভালো হয়েছে। মনে মনে কেদার বলে, তার পাস করাই উচিত হয়নি। নিজের বাড়িতে নিজের মা যার চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা এমন মারাত্মক রোগ শরীরে বয়ে বেড়িয়ে আজ মরতে বসেছে, তার অধিকার নেই পরীক্ষায় পাস করে ডাক্তার হওয়ার।

২

ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করার গোড়ায় কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা জোটে, কতদিকে কত যে অনিশ্চয়তার মীমাংসা করে নিতে হয় !

অভিজ্ঞতাগুলি হয়তো বিচিত্র মনে হয় অনভিজ্ঞতার জন্য। নতুনত্ব আশ্চর্য করে দেয় নতুন ডাক্তারকে। কীভাবে চিকিৎসা-বিদ্যা কাজে লাগাবে স্থির করে নিয়ে স্থিতিলাভ করার পর বোধ হয় ডাক্তারের জীবনও হয়ে যায় একঘেয়ে, মনকে এতটুকু নাড়া দেবার মতো আর কিছুই ঘটে না।

একদিন যা মনে হয়েছিল সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার সেটাই বারবার ঘটে অতি সাধারণ ঘটনার মতো।

সারা জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ ঠিক করে নিয়ে পুরো দমে ডাক্তারি আরম্ভ করার আগেই যে সব ছাড়া ছাড়া অভিজ্ঞতা জোটে কেদারের ; তা শুধু তাকে আশ্চর্য আর অভিভূতই করে দেয় না, রীতিমতো বিচলিত করে তোলে।

এবার কী করবে সে বিষয়ে একেবারে মনস্থির করে ফেলার কাজটা আরও কঠিন করে দেয়।

শুভময়ীর মৃত্যু তাকে বেশ খানিকটা কাবু করে দিয়েছে। যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাব ভাব ক্রমে ক্রমে অনুভব করছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলার দিন কাছে ঘনিয়ে আসার সঙ্গে, মার আকস্মিক মরণ যেন শতগুণ জোরালো করে দিয়েছে সেই ভাব।

শুভময়ী মারা না গেলে হয়তো ইতিমধ্যেই তাকে করে ফেলতে হত চরম সিদ্ধান্ত। গীতা তাকে রেহাই দিত না, সময় দিত না। নিজে উদ্যোগী হয়ে কেদারকে আর ডাক্তার পালকে নিয়ে পরামর্শ সভা বসিয়ে ঠিক করে দিত কেদার কখন কীভাবে বিদেশে যাবে, কী কী ব্যবস্থা দবকার হবে সে জন্য।

শুভময়ীর মরণ যেমন একদিকে এলোমেলো করে দিয়েছে চিন্তা, অন্যদিকে তেমনি কিছু সময়ও তাকে পাইয়ে দিয়েছে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার জন্য।

মার শোকে তাকে এত বেশি বিচলিত হতে দেখে গীতা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায়নি।

সে বলতে গিয়েছিল, মা কি চিরদিন থাকে ?

কেদার বলেছিল, শুধু শোক হয়নি গীতা। আমি এদিকে ডাক্তার হচ্ছি, আমাকে ডাক্তার কবার জন্য মা ওদিকে মরছে। আমাকে ডাক্তার করার খরচ জোগাতে বাড়ির লোকেব অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে, মাকে মরতে হয়েছে। আমি যেদিন ডাক্তার হলাম, মা সেইদিন মবল। খবরটা শুনেও গেল না। মার শরীরটা যে ভয়ানক খারাপ হয়েছে, এটুকু আমার ধরা উচিত ছিল।

তারপর গীতা আর এ বিষয়ে কথা বলেনি।

কেদার হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে নিয়মিত গিয়ে বসে। হর্ষ ডাক্তার এবং তার পরিবারের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকে জানাশোনা।

এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা। স্থায়ী ব্যবস্থা ঠিক হওয়া পর্যন্ত।

হর্ষ ডাক্তার বলে, তোমার কাছে লুকোনো কিছু নেই। এই দোকানটি আর পশারটুকু আমার সম্বল। বিরাট ফ্যামিলি, দুটি মেয়ে পার করেছি।

আমি জানি না ?

জানো বলেই বলছি। এবার জ্যোতিটার পালা। ওর জন্য তোমার মতো ডাক্তার জামাই আনতে আমি একপায়ে খাড়া। কিন্তু একটা ডিসপেনসারি করে দিয়ে জামাই আনার সাধ্য আমার নেই।

সে তো জানি কাকা। জ্যোতি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো ! ওর জন্য আমিও ছেলের সন্ধানে আছি।

কেদার এ ভাবে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে ডিসপেনসারি একটা যৌতুক দিতে চাইলেও সে জ্যোতিকে বিয়ে করবে না।

কেদার আবার বলে, কিন্তু এবার ওর বিয়েটা দিয়ে দিতেই হবে কাকা। দিনকাল খারাপ, আপনার টানাটানি, এ সবের জন্য তো বয়সটা ওর বসে নেই !

তা তো বটেই।

হর্ষ বিরাগভরা দৃষ্টিতে তাকায়। তার ডিসপেনসারিতে বসে তার বদলে তার মেয়ের জন্য ওর বেশি দুর্ভাবনা, যে নাকি ওর মায়ের পেটের বোনের মতো।

তার দিকে কেউ তাকায় না। তার কথা কেউ ভাবে না। হর্ষ ডাক্তারের সাধ হয় বেলা এই চারটের সময়েই আলমারিটা খুলে ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে ওষুধ তৈরির আড়াল করা অংশে গিয়ে গলায় ঢেলে দেয় খানিকটা নির্জলা ব্র্যান্ডি।

কম্পাউন্ডার দীনেশ এখনও আসেনি। ব্যাটা ঘড়ির কাঁটা ধরে সাড়ে চারটেয় আসবে। দু-চার মিনিট আগেও নয়, পরেও নয়।

কেদার খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, আমি ভাবছিলাম পরিমলের সঙ্গে দিয়ে দিলেই বা কী এমন আসে যায় ? কবিরাজিতেও পয়সা আছে এ দেশে। কবিরাজি পেটেন্ট ওষুধ বেচেই কতজন লাখপতি হয়ে গেছে। খোসপ্যাঁচড়ার ডাক্তারি মলম কবিরাজি নাম দিয়ে বিক্রি করে কত লোক বাড়ি করেছে। পরিমলকে একটু হেলপ্ করলেই ও দাঁড়িয়ে যাবে। তাছাড়া, জ্যোতির যখন অমত নেই কবিরাজে।

হর্ষ ডাক্তার চেয়ার ঠেলে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে সত্যসত্যই ব্র্যান্ডির বোতলটা ছিনিয়ে বার করে নেয়, মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে, তুমি যদি তোমার কব্‌রেজ বন্ধুটির জন্য ওকালতি আরম্ভ কর কেদার—

সাহস করে বাকিটুকু সে উচ্চারণ করতে পারে না।

পরিমলের উপর হর্ষের এই বিতৃষ্ণার ভাব কেদারের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। পরিমল সর্বদা আসে যায়, সে কবিরাজ হবে না ডাক্তার হবে না উকিল হবে এ সব কিছুই যখন স্থির ছিল না তখন থেকে হর্ষ ডাক্তারের পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে বিশেষ কোনো অবজ্ঞার ভাবও হর্ষের দেখা যায়নি কখনও, সে বরং নিজেই কোনো কোনো বিশেষ রোগে নাম করা কবিরাজি ওষুধের ব্যবস্থা দেয়।

বড়ো মেয়ের ডাক্তার জামাই এনেছিল হর্ষ, চোখ কান বুজে একটা ডিসপেনসারিও করে দিয়েছিল জামাইকে। হর্ষের আশা সফল হয়নি। তবে এ দেশে ডাক্তারের অন্ন মারা যায় না। নামের শেষে নিজেই একটা দুর্বোধ্য ডিগ্রি জুড়ে দিয়ে যে ডাক্তার সেজে বসে আর অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে মৃত রোগীকে পুনর্জীবন দান করে, তারও নয়। কিন্তু একটা ডিসপেনসারির বিনিময়ে ডাক্তার জামাই এনে লোকে তো আশা করে না যে মেয়ের শুধু অন্ন জুটবে !

ও সব দাবি দাওয়া না করে কেদার যদি জ্যোতিকে বিয়ে করে, হর্ষ কৃতার্থ হয়ে যাবে। বোধ হয় এই জন্যই তার মুখে পরিমলের কথা শুনে এত রাগ হয়েছে হর্ষর। আসলে হয়তো পরিমলের উপর তার বিদ্বেষ নেই।

কেদারের ডাক্তারত্বে জ্যোতির মোটেই শ্রদ্ধা নেই।

পাসের খবর শুনে সে বলেছে, পাস তো সবাই করছে। বাবার সময় যেমন ছিল তেমন তো আর কঠিন নয় পাস করা আজকাল।

এ যেন প্রতিধ্বনির মতো শোনায় তার ফ্রক পরা বয়সের কথার।

কেদার বলত, আমিও একদিন ডাক্তার হব দেখিস !

জ্যোতি বলত, বাবার মতো ডাক্তার হতে হয় না আর। বাবা স্কুলে ফার্স্ট হত জানো ?

দেবতাকেও অপমান করায় সংকটে পড়ে কেদার অগত্যা বলত, ভারী ডাক্তার তোর বাবা ! মদ খায়।

হিংস্র চোখে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে জ্যোতি চলে যেত।

আজও জ্যোতির অচেতন মনে ক্ষমা পায়নি কেদার। বেঁধে মারার মতো সে অপমান সত্যই অমার্জনীয় ছিল। তখন জানত না, আজ কেদার বুঝতে পারে স্নেহশীল শ্রদ্ধেয় পিতা দেবতাটির মদের নেশা কী মারাত্মক সংঘাত সৃষ্টি করে অল্পবয়সি সন্তানের মধ্যে !

দুরকম মানুষ, দুটো মানুষ তাদের বাবা ! সারাদিন সাধারণ ভালো মানুষ, আর দশজনেরই মতো, সারা বাড়ির আবহাওয়া স্বাভাবিক। রাত্রে কী অদ্ভুতভাবে বদলে যায় সেই একই মানুষটা, যেমন উদ্ভট আর ভীতিকর হয় মুখের চেহারা চোখের চাউনি তেমনি খাপছাড়া হয় কথা খেয়াল রাগারাগি। হর্ষ বোতলের ছিপি খুলে গেলাসে মদ ঢাললেই সমস্ত বাড়িটাতে ঘনিয়ে আসত একটা ভীত সন্ত্রস্ত থমথমে ভাব—মায়ের মুখ হত কঠিন, সতর্ক শঙ্কিত হত তার চালচলন।

কোমল মনের যেখানে ছিল ঘা ঠিক সেইখানে সে আঘাত দিত। তাকে একেবারে ক্ষমা করা সম্ভব নয় জ্যোতির পক্ষে। বাপ ডাক্তার, ভগ্নিপতি ডাক্তার, তাই উপায় নেই, নইলে সোজাসুজিই হয়তো ডাক্তার জাতটাকেই অপদার্থ অবজ্ঞেয় বলে জ্যোতি ঘোষণা করত।

একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে হর্ষ শান্ত হয়। এটুকু কিছুই নয় তার কাছে। লোকে টেরও পাবে না। বরং অস্থিরতা কেটে গিয়ে স্থৈর্য আর গাম্ভীর্য আসায় শ্রদ্ধাই বাড়বে লোকের।

শান্ত হয়ে ব্যাগ নিয়ে হর্ষ তার পুরানো গাড়িতে বেরিয়ে যায় কলে। বাইরে রোগী দেখে সাড়ে ছটা নাগাদ সে আবার ডিসপেনসারিতে ফিরবে।

খানিক পরে সেজেগুজে জ্যোতি আসে ডিসপেনসারিতে।

বলে, বাবা নেই ?

কলে বেরিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছ ?

সিনেমায় যাব। বাঃ রে, বাবা আজ এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল !

কেদার বলে, টাকা চাই বুঝি ? আমার কাছ থেকে নাও—হর্ষকাকার কাছে চেয়ে নেব।

খুব টাকা হয়েছে, না ? বাবার কাছে চাইতে শেষে তোমার লজ্জা হবে—কাজ নেই তোমার টাকা নিয়ে। দীনেশবাবু, ক্যাশে টাকা নেই ? আমায় দুটো টাকা দিন তো।

কম্পাউন্ডার দীনেশ হর্ষ বেরিয়ে যাবার পর এসেছিল, সে বলে, ডাক্তারবাবু চাবি নিয়ে গেছেন।

থাকগে, আজ যাবই না সিনেমায়।

কেদারকে বলে, চা খাবে তো এসো।

বাড়ি কাছেই হর্ষ ডাক্তারের। দু-মিনিটের পথ। পরিমলের ওষুধের দোকান সামনে পড়ে, তাকেও জ্যোতি চা খেতে সঙ্গে ডেকে নেয়।

কেদার তখন বুঝতে পারে, যেচে তাকে জ্যোতির চা খেতে ডাকার মানে।

শুধু হর্ষ ডাক্তারই বিরক্ত হয়নি পরিমলের উপর, বাড়ির লোকের কাছেও এতদিনে তাহলে আপত্তিকর হয়ে উঠেছে তার জ্যোতির সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ? পরিমলকে একা চা খেতে ডাকতে তাই ভরসা হয় না জ্যোতির ?

কেদার একটু অস্বস্তি বোধ করে। শুধু এইটুকুই যেন নয়, আরও কিছু আছে এর পিছনে। বাড়িতে ঢুকে এটা সে আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করে।

হর্ষ ডাক্তারের এই সেকেলে বাড়ির ঈষৎ স্যাঁতসেঁতে আর অল্প অল্প অন্ধকার ভিতরটা এবং ওখানকার বাসিন্দা মানুষ ও তাদের চালচলনের সঙ্গে তার ছেলেবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পরিমল বরং অনেক পরে তাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়াটে হয়ে এসে তারই বন্ধু হিসাবে এই পরিবারটির সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল।

মাঝখানে কিছুদিন সে আসেনি। শুভময়ীর মরণ আব নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই তার সঙ্গে এ বাড়ির মানুষগুলির সম্পর্কে যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে আজ সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ছেলেবেলা থেকে যে কেদার অসংখ্যবার এসেছে গিয়েছে খেলাধুলো উৎপাত করেছে ঠিক সেই কেদার যেন আজ আসেনি,—তাকে আজ একটু অন্যভাবে নতুনভাবে অভ্যর্থনা করা দরকার, একটু বেশি খাতির করা দরকার, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে আগের অনেকবারের চেয়ে তার আজকের আসাটা অনেক বেশি খুশির ব্যাপার সকলের কাছে !

কেউ জানত না যে সে এখন আসবে। জ্যোতি তাকে বিনা নোটিশে আচমকা ডেকে এনেছে।

তবু মনে হয় তাকে বিশেষভাবে খাতির করার জন্য সকলে যেন বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

জ্যোতির মা মোহিনী বলে, তোমার চেহারা এ কী হয়েছে বাবা ? খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না বুঝি ?

আবার নিজেই আপশোশ করে বলে, আর কেই বা করবে প্রাণ দিয়ে। যত্ন করার মানুষটাই চলে গেল।

পরিমলের দিকে ফিরেও তাকায় না মোহিনী।

প্রসাধন অসমাপ্ত রেখেই আসে জ্যোতির দিদি প্রীতি। সেও ফিরে তাকায় না পরিমলের দিকে। কেদারকে সস্নেহ অনুযোগ জানিযে বলে, ভুলে গেছ নাকি আমাদের ? একেবারে খোঁজখবর নাও না ? জ্যোতি বুঝি ধরে নিয়ে এল জোর কবে ?

তারপর নিজেই ভারিক্কি সুরে বলে, তা কাজকর্ম দায়িত্ব পড়ছে বইকী। সেটা বুঝিনে ভেব না ভাই।

হর্ষের দুটি ছেলে। একটি ছিল সবার বড়ো, অন্যটি কনিষ্ঠ। বড়ো ছেলেটি মারা গেছে সাত-আটবছর আগে। তার বিধবা বউ রেবা এসে পরিমলকে বাদ দিয়ে কেদারকে বলে, গরম গরম লুচি ভেজে দিই, তারপরে চা খেয়ো। কী কষ্টে যে একটু ময়দা জোগাড় হয়েছে। আবার কবে পাওয়া যাবে কে জানে ?

নির্বিকার অবহেলার ভঙ্গিতে জ্যোতি একটু বাঁকা হয়ে দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে তার মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি। এ সব যেন তার নিজেরই রসিকতা, অবজ্ঞা ভরা আনন্দে সে ব্যাপারটা উপভোগ কবছে।

দিঘল সে মানানসই। তাই, বাইশ বছর বয়সটা তার দেহে হঠাৎ খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে না। এইরকম কোনো একটা ভঙ্গি করে দাঁড়ালে তখন নিথর তরঙ্গের মতো স্পষ্ট রূপ নেয়।

বোনের দিকে তাকায় প্রীতি। ভঙ্গিটা তাকে যেন সুখীই করে। পরিমল জ্যোতির দিকে চেয়ে আছে দেখে বিরক্তির ভ্রূকুটি করে প্রীতি।

এই নগ্ন কুৎসিত সমাদর, এই নোংরা খাতির অসহ্য হয়ে উঠত কেদারের, গায়ে তার জ্বালা ধরে যেত—এদের সঙ্গে পরিচয়টা যদি একটু কম ঘনিষ্ঠ হত তার। নিজের বাড়ির লোকের মতোই এদের কারও সম্পর্কে তার কিছুই অজানা নেই।

আচমকা আজ এদের এই খাপছাড়া ব্যবহারের গুরুত্ব সে টের পায়। সবটা না ধরতে পারলেও খানিকটা অনুমান করে নিতে পারে এর পিছনের আসল বাস্তবতা।

এই নগ্ন আক্রমণ শুধুই তার মন ভুলাবার চেষ্টা নয়, তা হলে পরিমলের সামনে এ অবস্থায় এ ভাবে কখনই আত্মপ্রকাশ করত না—জ্যোতি তাকে আজ হঠাৎ চা খেতে ডেকে আনবে এ

সুযোগের অপেক্ষায় সকলে বসে থাকত না। যে কোনো দিন যে কোনো সময় তাকে ডাকিয়ে এনে অতিরিক্ত সম্মান ও আদর জানাবার জন্য কোনো অজুহাতই দরকার ছিল না এদের।

আজকের এটা ওদের আরও বড়ো সংগ্রাম।

কোনো কারণে মরিয়া হয়ে উঠতে হয়েছে এদের। জ্যোতিই ঘটিয়েছে কারণটা সন্দেহ নেই। আজ জ্যোতি তাদের দুজনকে একসাথে ডেকে নিয়ে আসায় এমনি নগ্নভাবে স্পষ্টভাবে নিজেদের মনোভাব তাকে আর পরিমলকে না জানিয়ে দিয়ে কোনো উপায় থাকেনি এদের।

পরিমল বলে, আমি উঠলাম। একজন রোগী আসবার কথা আছে। বলে সে সত্যসত্যই উঠে দাঁড়ায়।

জ্যোতি হেসে বলে, হার মানলে তা হলে ?

মোহিনী তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলে, জ্যোতি !

তারপর শান্তকণ্ঠে পরিমলকে বলে, একটু বোসো বাবা, চা খাবারটা খেয়ে যাও।

আরেকদিন খাব।

পরিমল চলে যাবার পরে বড়োই তাড়াতাড়ি ঘর খালি হয়ে যায়। ঘরে থাকে শুধু জ্যোতি। সেও চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে কিন্তু তাকে লুচির থালা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জ্যোতি বলে, সবাই বুঝিয়ে দিয়েছে মনের কথা। আমিও আমল দিলাম। এবাব তুমি বলে ফেলো তোমার প্রাণের কথাটা।

আমার প্রাণে কোনো কথা নেই।

সেটা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই হত ! বললেই হত, না কাকিমা, অত আদরে আমার কাজ নেই, আমি লুচি খাব না।

আমার তো দরকার পড়েনি খেপে যাবার।

তার কড়া কথায় মুখ কালো হয়ে যায় জ্যোতির। সামনে এসে তীব্র চাপাগলায় বলে, আমায় কেন বলতে আসে তবে আমল দিই না বলে তুমি বিগড়ে গেছ ? আরেকজনকে আমল দিই বলে তুমি রাগ করেছ ?

কেদার চুপ করে থাকে। জ্যোতিকে নিয়ে এ বাড়ির সাম্প্রতিক সংঘাতটা এবার মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে তার কাছে।

জ্যোতি আবার বলে, লজ্জা করে না তোমার ? ডাক্তারি পাস করেছ বলে জগৎটাকে কিনে ফেলেছ নাকি ? মা-বাবার মনে মিথ্যে আশা জাগিয়ে কেন তুমি আমায় জব্দ করবে ? ডাক্তার ! মতিগতির ঠিক নেই, সে আবার ডাক্তার।

জল খেয়ে কেদার চায়ের কাপটা তুলে নেয়। মৃদুস্বরে বলে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জ্যোতি।

যদি হয়েই থাকে ? আমার কাছে পাত্তা পাও না, বাঁকাপথে বাড়ির লোককে বাগ মানিয়ে আমায় তুমি বশ করবে ? এত নিচু মন তোমার ? ডাক্তারি পাস করে দাম বেড়েছে, এমনি করে সেটা মা-বাবাকে ঘুষ দিয়ে তুমি গায়ের ঝাল ঝাড়বে আমার ওপর ?

কেদার জোর দিয়ে বলে, তুমি উলটো বুঝেছ। আমার গায়ে ঝাল নেই। কারও মনে আমি মিথ্যে আশাও জাগাইনি !

জ্যোতি ফোঁস করে ওঠে, মিছে কথা বোলো না। এমন করে আমায় তবে গঞ্জনা দিচ্ছে কেন ? আমায় বিয়ে করতে তুমি একপায়ে খাড়া, আমি শুধু দূর ছাই করি বলে, আরেকজনের সঙ্গে মিশি বলে তুমি বিগড়ে গিয়েছ—

ওরা মিথ্যে একটা ধারণা করেছে, তাতে আমার কী দোষ ?

না, তোমার কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার ! আমি মেয়ে কিনা, আমার ছাড়া কার দোষ হবে ?

একদৃষ্টিতে জ্যোতি তার দিকে চেয়ে থাকে।

তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ঘরে-বাইরে সবার মন জুগিয়ে চলতে হবে আমাকে, কেমন ? বেশ, তাই হোক। আমল দিতে বলেছে, আমিও আমল দিচ্ছি।

দ্বিধামাত্র না করে সে দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দেয়। জানালাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়।

কেদার দরজা খুলতে গেলে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, না আমি তোমায় যেতে দেব না। সে দিনকাল আর নেই ডাক্তারি পাস করা কেদারবাবু ! একটা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না তার বাপ-মার সাথে হাত মিলিয়ে।

তুমি এত বোকা ?

বোকা হই যা হই, তোমায় আমি রেহাই দিচ্ছিনে। একঘণ্টা পরে দরজা খুলব। সবাইকে জানিয়ে দেব, সামনের তারিখেই তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছ।

তারপর ?

বিয়ে হবে।

তারপর ?

তারপর আমি তোমায় মজা দেখাব। ডাক্তারি পাস করার সুযোগ নিয়ে বাপ-মাকে হাত করে গায়ের জোরে একটা মেয়েকে বিয়ে করার সুখ টের পাইয়ে দেব !

সে তো অনেক ঝঞ্ঝাট।

হোক ঝঞ্ঝাট।

ওভাবে আমায় মজা টের পাইয়ে দিতে গেলে নিজেও রেহাই পাবে না।

রেহাই চাই না আর।

কেদার হেসে বলে, তার চেয়ে এখন মাথাটা একটু ঠান্ডা করো না ?

মাথা আমার ঠান্ডাই আছে।

আছে ? তবে শোনো। আজকেই আমি হর্ষকাকাকে বলছিলাম, পরিমলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বন্ধুর পক্ষে ওকালতি করছি বলে উনি চটে গেলেন।

জ্যোতির কালো চোখে বিহ্বলতা ঘনিয়ে আসে।

সত্যি বলছ ?

মিছে বলব কেন ? বুঝতে পারছ না, তুমি আমার পায়ে ধরে কাঁদলেও তোমায় আমি বিয়ে করব না ?

তাই নাকি !

হর্ষকাকাকে কথায় কথায় আরও কী জানিয়ে দিয়েছি জানো ? তুমি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো।

এ কথা আগে বললেই হত !

জ্যোতি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়।

এত তাড়াতাড়ি খুলে দেয় যে বন্ধ দরজার ও পাশে দাঁড়িয়ে যারা কান পেতে তাদের কথা শুনছিল তারা সরে যাবার সময়ও পায় না।

৩

কেদার ও পরিমলের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব ছিল।

অথচ আজও তারা পরস্পরকে জানে না বা মানেও না বন্ধু বলে। বন্ধুত্বের চলতি ধারণায় তাদের সম্পর্কটাকে, দীর্ঘদিনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও, বন্ধুত্ব অবশ্য বলা চলে না কোনোমতেই। দুটি তরুণের মেলামেশা কথাবার্তা নিয়েই শুধু বন্ধুত্ব হয় না, হাসি তামাশা ইয়ার্কি ফাজলামি থেকে কলহ এবং মান অভিমানের পালাও চলে তাদের মধ্যে। কেবল দুজনে মিলেই সরস গল্পে আড্ডা জমিয়ে তুলতে পারে।

নেহাত যদি রসকষহীন অত্যন্ত ভারিক্কি প্রকৃতির মানুষ হয় দুজনে, দেখা হলে জীবনের হালকা কথা যা কিছু আছে সব যদি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় জীবনের সীমানা পার করে, বড়ো বড়ো আদর্শের কথা আর মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ছাড়া কোনো বিষয়ে কথা বলাই মনে করে কথার অপচয়, তারাও বন্ধু হলে দুজনের মধ্যে ঘুচে যায় সচেতন গোপনতা, দুটি হৃদয় ও মনের মধ্যে দরজা থাকে খোলা।

বন্ধুত্ব কখনও গোপনতার আওতায় বাড়েও না, বাঁচেও না। দুজনের জানাজানির স্বচ্ছতাই বন্ধুত্বের প্রথম শর্ত—যে শর্ত প্রেমেরও বটে।

এ সব কিছুই নেই কেদার ও পরিমলের সম্পর্কে।

এতকাল একসাথে বাস করেও কোনোদিন একসঙ্গে তারা সশব্দে হেসে ওঠেনি কোনো কথায়, একসুরে বাঁধা দুটি তন্ত্রীর মতো। হাসির কথায় হাসি ফুটেছে দুজনেরই মুখে, স্মিতমুখে পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে তারা সায় দিয়েছে পরস্পরের রহস্য উপভোগে।

দূরের দুটি মানুষ যেন ইশারায় আদান-প্রদান করছে মনের ভাব, দুজনের মধ্যে স্থির করা কোডের ভাষায়।

পরস্পরকে নিজের কথা তারা বলে খুব কম।

দরদ সহানুভূতির দাবিদাওয়া তাদের মধ্যে একরকম নেই বলা চলে। কোনো কারণে একের জন্য অন্যের মনে সমবেদনা জাগলে সেটা মনের কোণেই থেকে যায়, প্রকাশ করার কোনো তাগিদ জাগে না একেবারেই।

কত স্বপ্ন কত কল্পনা আর দাবিদাওয়া অধিকার বোধ ভরা দুটি তরুণ মন, কত সমস্যা আর কত ব্যর্থতা ক্ষোভ ও নালিশ, কতরকম বিশ্বাস সংস্কার সংশয় সিদ্ধান্ত মতামত। কিন্তু এ সবের ব্যক্তিগত গুরুত্বই বড়ো হয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের কাছে, মিলিয়ে নেবার বা তুলনা করবার সাধ কখনও জাগে না।

তাই কথাবার্তা তাদের গভীরভাবে ব্যক্তিগত হয় কদাচিৎ। যখন হয় তখনও অনুভূতিগত প্রক্রিয়াকে রূপ দেবার ব্যাকুলতা দেখা যায় না একজনের মধ্যেও।

এত কাছের দুটি যুবকের মধ্যে এ রকম আবেগহীন সম্পর্ক কিন্তু এতখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিশোর বয়সে, দুটি পৃথক চিকিৎসা-বিদ্যাকে পেশা হিসাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা আরম্ভ করার আগে।

দুটি পরিবারের মধ্যে অনায়াসে আপনা থেকে যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল হৃদয়গত প্রেম ভালোবাসা হিংসা বিদ্বেষ পছন্দ অপছন্দ এবং পারিবারিক জীবনের অসংখ্য সমতার ভিত্তিতে, তাদের দুজনের তখনকার বন্ধুত্বের ভিত্তিও ছিল সেই পারিবারিক জীবন।

একতলা এবং দোতলা-বাসী দুটি পরিবারের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল একটা অনির্দিষ্ট রকমের, যার কোনো সমগ্রতা ছিল না, এখনও নেই:

তা, উপর থেকে তলা পর্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এ ভাবেই গড়ে ওঠে।

এ পরিবারের বিশেষ একজনের সঙ্গে হয়তো ওই পরিবারের বিশেষ একজনের গভীর অন্তরঙ্গতা। যেমন, নীচের তলার অমলার সঙ্গে উপরতলার রাণীর। জনার্দনের সে ভাইঝি। বয়সে সে অমলার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়ো এবং সে বিধবা। অথচ তাদের এত ভাব যে মনে হয় দুজনে যেন তারা সই পাতিয়েছে। সুযোগ পেলেই তাদের পরস্পরের কাছে আসা, অন্তহীন ফিসফিসানি। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাদের কারও একজনের দুটি বাড়তি কথা বলাবলি নেই !

মায়া প্রায় সমবয়সি অমলার এবং সে কুমারীও বটে। কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে রস পায় না অমলা, কেদারের বিধবা দিদি বিমলার সঙ্গেও যেমন রাণীর বনে না।

উপরতলার ছোটোদের সঙ্গে উপেনের বড়ো ভাব, বড়োদের সঙ্গে তার মনের মিল হয় না কিছুতেই ! জনার্দনের ছোটো মেয়ে ফুলু উপেনের কোলে পিঠে চেপে বড়ো হয়েছিল। ফুলুকে আদর না করে যেন উপেনের দিন কাটত না। মনে হত যেন জনার্দনের মেয়ে রাখার জন্য সে মাইনে করা ছোকরা চাকর। মাঝরাতে এক-একদিন ঘুম ভেঙে উপেনের কাছে যাওয়ার জন্য ঝোঁক চাপত ফুলুর, কিছুতেই তার কান্না থামানো যেত না।

ফুলু বড়ো হতে ধীরে ধীরে উপেনের ভালোবাসাতেও ভাটা পড়ে এসেছিল। বারো-তেরোবছর বয়সে আজও ফুলু মাঝে মাঝে অনেক আশা করে উপেনের কাছে যায়, কিন্তু আশা তার মেটে না। উপেনের সমস্ত মায়া মমতা যেন উপে গিয়েছে।

তাই মনে হয় ফুলুর। তার জন্য যে ভালোবাসা ছিল উপেনের সেই ভালোবাসাই যে আজ পুরোমাত্রায় ভোগ করছে পাশের বাড়ির তিন-চারবছরের শিশু মেয়েটা, ফুলুর পক্ষে সেটা ধারণা করাও অসম্ভব।

একজনের জন্য ভালোবাসা কখনও অন্যে পায় ?

মায়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে উপেনের একটু ভাব হবার উপক্রম দেখা যায়।

খানিকটা এগিয়ে সেটা থেমে যায় একেবারেই।

প্রমথ ও জনার্দনের মধ্যে খুব বনিবনা। দুজনের অবসর কাটে দাবা খেলে আর সংসারী মানুষের সুখদুঃখের প্রাণখোলা আলোচনায়। কোনো প্রত্যাশা নেই বা নালিশ নেই পরস্পরের সম্পর্কে, সংসার তাদের দুজনকেই সমানভাবে শুষে নিয়েছে।

দুজনেই এক বাড়িওয়ালার ভাড়াটে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ তাদের আরও বেশি আপন করে দিয়েছে।

এই দুজন বুড়োর চেয়েও শান্ত ও সংযতভাবে কেদার ও পরিমল কথা বলে। কাছাকাছি এলে দুজনেই তারা আপনা থেকে কেমন শান্ত ও নিরুত্তেজ হয়ে যায়। আলাপ তাদের হয় বিরামবহুল। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাছাকাছি বসে থাকলেও তাদের কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ হয় না।

অন্তত এ পর্যন্ত হয়নি।

কিন্তু তাদের চা খেতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জ্যোতি যে কাণ্ডটা করল তারপর থেকে কথা বলা কিংবা চুপ করে থাকা দুটো প্রক্রিয়াই রীতিমতো পীড়াদায়ক হয়ে উঠল তাদের কাছে।

এই যেন মানে ছিল তাদের এতদিনকার প্রাণহীন সম্পর্কের ! যত সংঘাত ছিল তাদের মধ্যে সব তারা একটা নিরপেক্ষ অহিংস উদারতার আড়াল দিয়ে চাপা দিয়ে চলত।

জ্যোতি যেন শেষ করে দিয়েছে সে অধ্যায়। টেনে খুলে দিয়েছে তাদের মুখোশ।

জ্যোতির বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলবে ভেবেই রাত্রে কেদার পরিমলের ঘরে গিয়ে বসে। কিন্তু গিয়ে বসে টের পায় জ্যোতির কথা তোলাই যেন অসম্ভব, কী বলবে কীভাবে বলবে ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।

পরিমলের ছোটো ঘরখানার একটা অত্যধিক ধোয়া মোছা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধভাব, ধূপচন্দনের গন্ধের আভাস মেলে। ঘরে টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। মোড়া জলচৌকি আর কম্বলের আসন আছে বসবার জন্য, একপাশে মেঝেতেই পাতা হয়েছে বিছানা। সকালে বিছানা তুলে নিয়ে মেঝে ধুয়ে ফেলা হয়। বিছানার চাদর ও আলনার জামা কাপড় দেখলেই টের পাওয়া যায় যে সবগুলিই বাড়িতে কাচা, কোনোটিতেই ধোপাবাড়ির ইস্ত্রি হয়নি। ধোপাবাড়ি না যাক, ইস্ত্রি না হোক, জামা কাপড় বিছানার চাদর কোনোদিন তার ময়লা দ্যাখেনি কেদার।

তাকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সম্পর্কিত বই সাজানো। মূল সংস্কৃত বইগুলির সঙ্গে ইংরাজি বাংলা বইও স্থান পেয়েছে।

পরিমল হোমিয়োপ্যাথির বই পড়ছিল। আয়ুর্বেদীয় উপাধির সঙ্গে সে আরেকটি উপাধি জুড়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করে।

পরিমলের ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কল্পনা করাও কঠিন যে ডাক্তারি পড়তে না পারায় তার মনে গভীর ক্ষোভ জেগেছিল এবং আজও তার জের মেটেনি।

মনে হয়তো তার আজও ক্ষোভ রয়ে গেছে যথেষ্ট, বাইরে সেটার প্রকাশগুলিই ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘর সাজানো থেকে বেশভূষা কথাবার্তা চালচলনে কত যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

পেশা যেন সত্যই ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে কলেজের সেই আধুনিকপন্থী স্মার্ট ছেলেটিকে !

হয়তো তাই ঘটে সংসারে। প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে, এ ভাবেই মানুষ খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে।

কেদার একটা সিগারেট ধরায়।

পরিমল তাড়াতাড়ি একটা মাটির সরা তার সামনে ধরে দেয় ছাই ফেলার জন্য।

কেদার বলে, খাওয়া হয়েছে ?

পরিমল বলে, না। মোটে সাড়ে নটা এখন।

তারপরেই শুরু হয় অস্বস্তি বোধ। কতবার এ ভাবে এসে বসেছে, এ রকম ছাড়া ছাড়া দু-একটা কথা বলে চুপচাপ নিজের মনে নিজের কথা ভেবেছে অথবা আয়ুর্বেদের কোনো বই নিয়ে পাতা উলটেছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ রকম বোধ করেনি কেদার।

পরিমলকে বলার যেন কিছুই নেই তার। এ ঘরে এসে বসাটাই তার অর্থহীন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য জোর করে সে বলে, হোমিয়োপ্যাথির মূল কথাটা খুব সোজা। সাধারণ লোকে চট করে বুঝতে পারে। এ দেশের লোক তো সূক্ষ্ম, বিন্দু, অণু পরমাণু এ সব কথা সর্বদাই শুনছে।

পরিমল বলে, রথীনবাবুকে চেনো তো ? ওর কাছেই হোমিয়োপ্যাথি পড়ছি। অ্যাটম বোমা আবিষ্কার হওয়ায় উনি খুব খুশি হয়েছেন। অ্যাটম বোমা নাকি প্রমাণ করেছে হোমিয়োপ্যাথির থিয়োরি অভ্রান্ত। উনি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছেন ইংরাজিতে।

কেদার বলে, অ্যাটমিক এনার্জি দিয়ে বোমা তৈরির কথাই লোকে শুনছে। মানুষের কত উপকারে লাগানো যায় অ্যাটমিক এনার্জি সে সব শোনাই যায় না একরকম। ধরো, একটা পাহাড়ের জন্য মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। গোটা পাহাড়টা অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।

পরিমল সায় দেয় না।

তাকে কী উপকার হয় মানুষের ? পাহাড়টা তো শূন্যে মিলিয়ে যাবে না, পৃথিবীতেই ছড়িয়ে থাকবে। যেখানে ছিল সেখানে এক জায়গায় জমাট হয়ে না থাকার জন্য হয়তো পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। পাহাড়ও তো অকারণে সৃষ্টি হয়নি। পাহাড় যেখানে থাকে সেখানে থাকার একটা সার্থকতা আছে নিশ্চয় !

তারা আলাপ করছে, এত কথা বলছে। কিন্তু কোনো মানে আছে কী এ রকম কথা বলার ?

খানিক চুপ করে থেকে আবার জোর করে কেদার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, রোগীপত্র কী রকম হচ্ছে ?

একে দুয়ে বাড়ছে। একটা ব্যাপার ভালো লাগছে না মোটে। মোদকের খদ্দের সব চেয়ে বেশি হচ্ছে। আর কি জানো ? লোকে রোগের চিকিৎসার চেয়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো করার সস্তা ওষুধ খোঁজে কবিরাজের কাছে। খাঁটি ওষুধ কি সস্তায় হয় ?

খাঁটি ওষুধেই কি স্বাস্থ্য হয় ? খেতে না পেয়ে শরীরে পুষ্টি নেই, ওষুধে কি হবে ?

আমাদের সে ব্যবস্থা আছে। আমাদের ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা জড়ানো, পথ্য বাদ দিলে চলবে না।

পথ্য কেনার পয়সাই যে লোকের নেই।

চিকিৎসক তার কী করবে ? আমরা রোগের ব্যবস্থা দিতে পারি, রোজগারের ব্যবস্থা তো করতে পারি না।

জ্যোতির কথা না তুলেই কেদার নীচে নামে। খেতে বসে তার মনে হয়, কবিরাজ হতে হওয়ার আপশোশ সত্যই কমে এসেছে পরিমলেব। সে যেন আত্মরক্ষার জন্য মনের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে, জোর করে বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজের পেশায় নিষ্ঠা আর ভক্তি।

নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে তার পেশা-আশ্রয়ী জীবনের প্রয়োজনের সীমানার মধ্যে।

আর কিছুদিন বাদে হয়তো সে ডাক্তারি চিকিৎসা পদ্ধতিকে টিট্‌কারি দিয়ে মন্তব্য করবে, কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রশংসার সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাবে ভারতের সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকে।

পরিমল চিরদিনই শান্ত এবং সংযত। কেদারের কাছ থেকে সিগারেটে দু-একটা টান দিতে শিখেছিল, কিছুকাল পরে তাও বর্জন করে দেয়। কোনোরকম অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। আচার নিষ্ঠার শুচিবাই তার ছিল না বটে তবে জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করার আনুষ্ঠানিক দিকটার উপব ঝোঁক তার বরাবরই ছিল।

দাঁতমাজার কাজটাকে পর্যন্ত সে কখনও কোনো প্রয়োজনের খাতিরে সংক্ষেপ করে না।

জীবনকে আরও শুদ্ধ আরও পবিত্র করার এই ঝোঁকটা যেন এবার হঠাৎ তার আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

মাংস সে কোনোদিন খেত না। এবার মাছ খাওয়াও ছেড়ে দেয়। বাড়িতে মাংস পেঁয়াজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ঘরে তার আবির্ভাব ঘটে একটা মৃগচর্মের।

সকাল সন্ধ্যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে সে কিছুক্ষণ যোগাসনে বসে ধ্যান করে।

নিজের বেশ এবং ওষুধের দোকানেও সে পরিবর্তন আমদানি করে। তাঁতের ধুতি গরদের পাঞ্জাবি আর গরদের চাদর ছাড়া আজকাল সে চৌকাঠের বাইরে পা দেয় না। দোকানের সাধারণ টেবিল চেয়ার আলমারি সরিয়ে দিয়ে আধুনিকতম ডিসপেনসারির উপযোগী দামি আসবাব এবং কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে কিছু ডাক্তারি ওষুধ ও যন্ত্রপাতি এনে দোকানটাকে ঝকঝকে করে সাজায়।

সকালে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে কেদাব ডাকে, চা খেয়ে যাও।

চা খাই না। ছেড়ে দিয়েছি।

এক মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়ায় না পর্যন্ত। মুখ ফিরিয়ে কথাটা বলতে বলতেই বেরিয়ে যায়।

জ্যোতি তাকে চা খেতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। জ্যোতির আপনজনেরা যে অপমান করেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় আরও অনেক কিছু করা ও ছাড়ার সঙ্গে চা খাওয়া পর্যন্ত সে ত্যাগ করেছে !

কেদার ভাবে, এ কী সংযম অথবা মানসিক অসংযমের বাহ্য প্রকাশ ? রাগ আর অভিমানকে যে বশ করতে পারে না, গায়ের জ্বালায় মাছ ছাড়ে চা ছাড়ে আচার-নিষ্ঠা বাড়িয়ে দিয়ে আত্মনির্যাতনের মধ্যে প্রতিশোধ নিতে চায়, তার কি সে রকম মনের জোর থাকা সম্ভব যা না থাকলে সংযমের কোনো মানে হয় না ?

কয়েকদিন পরে জ্যোতি আসে।

দুপুরবেলা। খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবাব পব ঘরে ঘরে যখন পুরো বিশ্রামেব পালা মেয়েদের।

একটু শুয়ে ঝিমিয়ে নিয়ে কেদার তখন উঠে বসে সিগারেট ধরিয়েছিল।

পরিমল দুপুরে শোয় না। দিবানিদ্রা বহুকাল থেকেই তার কাছে নিষিদ্ধ। সম্ভবত সে কোনো শাস্ত্র পাঠ করছে।

জ্যোতি কেদারকে বলে, ওকে সব বলেছ ? সেদিনের কথা ?

না।

কেন বলোনি ? আমার একটু উপকার হত !

সেদিন ঘরে খিল দিয়ে তাকে আটক করার মতো বেযাদবিতেও যার উপর বাগ কবতে পারেনি আজ হঠাৎ অসহ্য ক্রোধে তার গালে একটা চড় কষিয়ে দেবাব ইচ্ছা হয় কেদাবেব।

তোব কি লজ্জাশরম বলে কিছু নেই ?

জ্যোতি সতেজে জবাব দেয়, না। লজ্জাশরম রাখতে দিচ্ছ না তোমরা। আমি আশা করে আছি তুমি সব কথা খুলে জানিয়ে দেবে, এটুকুও করতে পারলে না তুমি আমার জন্য ? কোন মুখে তুমিই আবার লজ্জাশরমের কথা বলছ ?

কেদার চুপ করে থাকে।

জ্যোতি আবার বলে, কেউ কিছু করবে না আমার জন্যে। এতটুকু উপকার করাব বদলে শুধু ক্ষতি করবে আর বাদ সাধবে। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলেও কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই। সব করতে হবে আমাকেই। তবু তোমরা চাও যে আমি মুখচোরা লাজুক মেয়েটি সেজে থাকি। তাই থাকতেই আমি চাই—

থাক গে জ্যোতি। এ সব বলে লাভ নেই।

তুমি বকলে, তাই বলছি। তুমি ভার নাও না, আমি এখুনি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি। কথা দাও সব ঠিক করে দেবে, তাবপর এতটুকু বেহায়াপনা যদি দ্যাখো আমার, আমায় তুমি চাবুক মেবো।

কেদার চুপ করে থাকে।

ঘন কালো চোখে নালিশ আর ভর্ৎসনা নিয়ে খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে জ্যোতি উপরে চলে যায়।

আধঘণ্টা পরে কেদার জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যায়। তখনও জ্যোতি উপর থেকে নামেনি।

জ্যোতির চিন্তাই গুমোটের মতো ঘনিয়ে থাকে কেদারের মনে।

অনুচিত ? তাই যদি হয়, জ্যোতির অনুযোগের জবাব সে দিতে পারেনি কেন ?

কলেজে গীতার সঙ্গে দেখা করবে। পথে উঁকি দিয়ে যাবে শীতাংশুদের বাড়ি।

ছায়াবউদিকে পাশের খবরটা জানানো হয়নি।

একেবারে সে ভুলেই গিয়েছিল যে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্বামী আর শাশুড়ির শাসনাধীন ওই সাধারণ বউটির দাবিও কম নয় তার পাসের খবর জানবার।

এ পাড়াতেই ছিল শীতাংশুরা বহুকাল। মাস কয়েক আগে অন্য বাড়িতে উঠে গেছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সে মহোৎসাহে শীতুদার সঙ্গে বউ আনতে গিয়েছিল মফস্বলের এক শহরে। তখন কে জানত যে অতি সাধারণ মেয়ে ছায়া শীতুদার বউ হয়ে এসে তাকেই বিশেষভাবে এতখানি পছন্দ করে ফেলবে, সব সময় এমন উৎসুক হয়ে থাকবে তাকে তার ঘরোয়া স্নেহের পূজা দিয়ে খুশি করতে আর নিজে কৃতার্থ হতে।

শীতাংশুর বাবা ছিল প্রমথের বিশেষ বন্ধু। সে মারা যাবার পর প্রমথই পরিবারটির ভালোমন্দের দায়িত্ব পেয়েছিল। সে-ই চেষ্টা করে শীতাংশুকে চাকরি জুটিয়ে দেয়।

এখানে কম ভাড়ায় ভালো বাড়িতেই বাস করছিল—এখনকার তুলনায় অবিশ্বাস্যরকম কম ভাড়ায়। বাড়ি ভাড়া আকাশে চড়বার আগে থেকে বাস করছিল বলে চেষ্টা করেও বাড়িওলা ভাড়া কয়েক টাকার বেশি বাড়াতে পারেনি।

হঠাৎ এ সুবিধা ছেড়ে দিয়ে অনেক দূরে নোংরা স্যাঁতসেঁতে অন্য একটা বাড়িতে বেশি ভাড়া দিয়ে উঠে যাবার কী প্রয়োজন শীতাংশুর হয়েছিল কেউ জানে না।

প্রমথ এটা পছন্দ করেনি। শীতাংশু তার বারণ না শোনায় মনে বড়োই আঘাত লেগেছে প্রমথের। এমনি অকৃতজ্ঞ আর অবাধ্যই হয় বটে আজকালকার ছেলেরা !

চটে বলেছে, অনেক করেছি, আর কাজ নেই। এবার সম্পর্ক চুকল।

এটা অবশ্য কেদার বাড়াবাড়ি মনে করে প্রমথের। ওদের জন্য অনেক কিছু করার মানে তো ছিল খবরাখবর নেওয়া আর উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া—পয়সা খরচ করে কিছু করার দরকার হলে প্রমথ কী করত বলা যায় না।

নিজের আপিসে চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে শীতাংশুকে। কিন্তু এ জন্য সে তার খুশি আর প্রয়োজন মতো স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে না, সারা জীবন প্রমথের পরামর্শ শুনে চলবে আর প্রত্যেক কাজের কৈফিয়ত দেবে, এটা আশা করা সত্যই অন্যায় প্রমথের।

পাড়া থেকে চলে যাবার কিছুকাল আগে থেকে খুব ম্লান ও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ছায়ার মুখ, একেবারে যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।

এতদিনের জানাচেনা এ পাড়ার মানুষগুলিকে ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে যাবার চিন্তাতেই বোধ হয় মনটা তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

একমাত্র তাদের বাড়িতেই ছায়ার খুশিমতো আসা যাওয়ার অনুমতি ছিল। সকলে জানত যে শুভময়ী তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে, সে যেন তার নিজের ছেলের বউ এমনি একটা স্নেহ আছে তার জন্য।

আপিসে প্রমথের কাছে শুভময়ীর মরণের খবর পেয়ে একদিন ছায়া বাদে শীতাংশুরা সকলে এ বাড়িতে এসেছিল। কেদার বাড়ি ছিল না।

শুভময়ীর শ্রাদ্ধে ছায়ার উপর তার বিশেষ স্নেহের কথা স্মরণ করে ছায়াকে নিয়ে আসবার জন্য বিশেষভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল শীতাংশুকে।

আর সকলে এসেছিল, অসুখ করার জন্য ছায়াই শুধু আসতে পারেনি।

সরু গলির মধ্যে লম্বা প্যাটার্নের সেকেলে জীর্ণ পুরাতন দোতলা বাড়ি। শীতাংশুরা নীচের তলায় থাকে। নীচের তলা বলতে একদিকে পাশাপাশি দুখানা ঘর আর একফালি উঠান।

অদ্ভুত ব্যাপার কিছু না হলেও একটা যোগাযোগ ঘটে যায়, যার ফলে ছায়ার সঙ্গে নিরিবিলি কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ জুটে যায় কেদারের।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা অস্পষ্ট নম্বরটা কেদার মিলিয়ে নিচ্ছে, উপরতলার একজন বাইরে যাবার জন্য দরজা খোলে, দরজা বন্ধ করার জন্য তার সঙ্গে আসে একটি মেয়ে।

শীতাংশুবাবু থাকেন এখানে ?

থাকেন।—বলে লোকটা সোজা গলিতে নেমে যায়। মেয়েটি দরজা খোলা রেখেই উঠে যায় দোতলায়। দরজার কাছ থেকে কেদার দেখতে পায় ছায়া উঠানে বাসন মাজছে।

কেদারকে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। যেন কেদারের জন্যই প্রতীক্ষা করে বাসন মাজছিল !

দরজা দিতে দিতে বলে, আস্তে কথা কও।

কেদার বলে, কেন ?

সুযোগ যদি পেলাম, কটা দরকারি কথা আগে বলেনি। ওরা ঘুমুচ্ছে, আবার কবে সুবিধা হবে কে জানে ! অ্যাদ্দিনে তুমি এলে ?

বলে সে ছাইমাখা হাতেই হাত চেপে ধরে কেদারের। নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই একটু হাসে। হাসির সঙ্গে বিষাদ ঘনিয়ে আসে তার মুখে।

আঁচল দিয়ে কেদারের হাতের ছাই মুছে নিতে নিতে বলে, তা এক হিসাবে না এসে ভালোই করেছ।

ব্যাপারটা কী বলো দিকি ছায়াবউদি ?

ব্যাপার আমার পোড়া কপাল। তুমি আঁচও করতে পারনি কিছু ? তা, কী করেই বা পারবে ! একজনের মনগড়া মিছে জিনিস আরেকজন আঁচ করবে কীসে। অন্য কেউ হলেও বা কথা ছিল।

সোজা ব্যাপার মনে হচ্ছে না তো !

তোমায় বলতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে ভাই। এত ছোটোও হতে পারে মানুষের মন ? নিজের ভাইটিকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এলাম। তোমার মধ্যে ভাইও পেলাম দেওরও পেলাম। তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, জোয়ান হয়েছ—আমিও কী ছেলে বিইয়ে সংসার করে বুড়িয়ে গেলাম না ? তুমি জোয়ান হয়েছ বলে আমাদের নিয়ে যা তা কী করে মনে এল ভাব দিকি ? তুমি যদি নিজের মায়ের পেটের ভাই হতে, সত্যিসত্যি আমার দেওর হতে ?

কেদারের মুখ কালো হয়ে যায়। হতভম্বের মতো সে বলে, এ সব কী বলছ ? শীতাংশুদা— ?

আমিও গোড়ায় বিশ্বাস করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, না বুঝে শুনে বিশ্রী একটা ঠাট্টা করছে বুঝি। ওমা, শেষে দেখি, মনটা সত্যি বিষিয়ে গেছে। পরীক্ষার আগে সেই যে একদিন ও বাড়িতে তোমায় খাইয়েছিলাম, সেইদিন জানিয়ে দিলে, না, আর এখানে থাকা নয়।

এই জন্য বাড়ি বদলেছে ?

তাছাড়া কী ? মনে নরক ঢুকেছে, তাই পছন্দ হয়েছে নরক।

এক মুহূর্ত ভেবে কেদার বলে, আমি বরং তবে চলেই যাই।

ছায়া বলে, ছি ! কেন চলে যাবে ? তোমার আমার মনে তো কিছু নেই।

তাতে কী আর আসবে যাবে বউদি ?

ম্লান মুখে ছায়া নিশ্বাস ফেলে।

বলে, সে তো বটেই। সেই জন্যেই তো তোমায় সব খুলে বললাম। কিছু না জেনে তুমি সরল মনে আসবে, আগের মতো ব্যবহার করতে যাবে—ফল হবে আরও খারাপ। তোমায় সব জানিয়ে দিলাম, তুমিও এবার বুঝে শুনে চলতে পারবে। তাই বলে বাড়িতে এসে না বসে চলে যাবে ? তুমি তো আমার কাছে আসোনি একা। মা আছেন ঠাকুরঝি আছেন—

কিন্তু এই দুপুরবেলা ?

ছায়া নিশ্বাস ফেলে উঠানের দিকে তাকায়। এ জগতে মিথ্যাকেও সম্মান করতে হয়। পরাধীন জীবনে মিথ্যা অপমানকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয় মাথা পেতে।

বলে, তাহলে চলেই যাও। একদিন সকালে নয় সন্ধ্যার দিকে এসো। এ রকম হয় কেন ঠাকুরপো ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে এক মুহূর্তও দেবি হয় না কেদারেব। নিচু গলাতেই সে কথা বলে কিন্তু ঝাঁঝটা টের পাওয়া যায়।

উপন্যাস পড়ো না ? সিনেমা দ্যাখো না ? শীতুদা বুঝি কোনো বইয়ে দেওর বউঠানের ভালোবাসার গল্প পড়েছে, নয় তো সিনেমা দেখে বুঝেছে যে প্রাণের টান মানেই সস্তা পিরিত। মানুষকে পশু প্রমাণ করার চেষ্টাই চলছে কিনা সিনেমাগুলিতে।

দরজা খুলে নেমে যেতে যেতে কেদাব ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, পাস করেছি খবর দিতে এসেছিলাম।

কেদার গীতাদের জগতের মানুষ নয়।

গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবাব পরেও ওই জগতের সঙ্গে তার পরিচয় খুব বেশি বাড়েনি।

গীতাদের জগৎ বলতে অবশ্য একটা বোঝায় না যে তাদের মতো সাধারণ মানুষদের জগৎ থেকে সেটা একেবারে সব দিকে দিযে বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ পৃথক। গীতার সঙ্গে তার পরিচয় হওয়াটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল না কিছুই।

এ রকম পরিচয় সর্বদাই ঘটছে দু-জগতের মানুষের মধ্যে।

আশ্চর্য যা ছিল তা এই যে পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতাব দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ বা ঝোঁকটা এসেছিল গীতার দিক থেকে। গীতা নিজে চেষ্টা করে গড়ে না তুললে তাদের পরিচয় হয়তো প্রাথমিক স্তরের বন্ধুত্বের সীমার মধ্যেই আটকে থাকত। সে কখনই চেষ্টা করত না গীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার।

গীতা সরলভাবেই বলেছিল, তাদেব স্তরেব বড়োলোক অ্যারিস্টোক্র্যাট ছেলেদের বিরুদ্ধে তার কোনো নালিশ নেই, ওই স্তবে মনুষ্যত্বের অভাব ঘটেছে বলেও সে মনে করে না, মোটেই তার দম আটকে আসে না ওই সমাজে মেলামেশা করতে।

তবে কিনা ওই সব ছেলেদের জীবনে সত্যিকারের কোনো লড়াই নেই। বড়ো হবার সববকম সুবিধা সামনে ধরাই আছে, গ্রহণ করলেই হল। লড়াই করে জীবনে বড়ো হবার প্রয়োজন ওদের নেই।

কেদার বড়ো হতে চায়, জীবনে উন্নতি করতে চায়। রীতিমতো যুদ্ধ না করে সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যত কিছু সুযোগ সুবিধা দরকার সব তাকে নিজে সৃষ্টি করে নিতে হবে। সামনে তার সোজা পথ খোলা নেই, তাকে উঠতে হবে নিজের জোরে নিজে পথ করে নিয়ে।

তার বাবা ডাক্তার পালকে যেভাবে উঠতে হয়েছে।

এই যুদ্ধটা গীতা ভালোবাসে।

তাই সে পছন্দ করে কেদারকে।

অবশ্য এ জন্য কেদারকে শুধু সে পছন্দই করেছিল। তার বন্ধুত্ব কামনা করেছিল। কেদারকে তার ভালোবাসার কারণ এটা নয়।

কেদার তার হৃদয় জয় করেছে কেদার হিসাবেই, মানুষ হিসাবেই। গীতা কী আর ভেবেচিন্তে হিসাব করে তাকে ভালোবেসেছে ?

হিসাব করে কী ভালোবাসা হয় ?

না ভালোবাসার হিসাব থাকে ?

এই প্রসঙ্গে গীতা জোর দিয়ে বলেছিল, তাই বলে ভেবো না কিন্তু আমার এটা সিনেমা নভেলের প্রেম। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমার লাইফের স্ট্যান্ডার্ড ছেড়ে গরিব মানুষ তোমার পাশে এসে দাঁড়াব আর সারাজীবন ছেঁড়া কাপড় পরে হাসিমুখে হাঁড়ি ঠেলব। তোমায় ওপরে উঠতে হবে। তুমি নিজেই জীবনে উন্নতি করতে চাও, এবার আমার জন্য আরও বেশি করে চাইবে !

বলে গীতা হেসেছিল, আমি অবশ্য তোমায় হেল্‌প করব। এ তো আর নতুন কিছু নয়, শত শত ঘটছে। মেয়ের বাপের টাকায় ছেলের বিলেত যাওয়া নিয়ে কেউ আজকাল একটা গল্প পর্যন্ত লেখে না, এমন পুরানো একঘেয়ে হয়ে গেছে ব্যাপারটা !

গীতার সরল সহজ কিন্তু স্পষ্ট সতেজ হাসি আর কথা কেদারকে মুগ্ধ করেছে বরাবর।

কোনোদিন সে গোপন করার চেষ্টামাত্র করেনি যে তার পছন্দ করা কেদার ছেলেটিকে ভবিষ্যতে স্বামী করার জন্য মানুষ করে তোলার প্ল্যান তার আছে—কেদারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সে ঠিক করেছে এই প্ল্যান।

আন্তরিকতার সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছে, পুরানো হোক, একঘেয়ে হোক, আমাদের এই ব্যবস্থাই ভালো। প্রেম-ফ্রেম বুঝিনে আমি, সত্যি বলছি। এইটুকু জানি যে তোমার সঙ্গে না হলে এ জন্মে হয়তো বিয়েই আমার হবে না। হয়তো বলছি এই জন্য, পাঁচ-সাতবছর পরে হয়তো আমি বদলেও যেতে পারি। হয়তো আরেকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, হয়তো মনে হবে, এ মানুষটাকেও জীবনের সাথি করা যায়। একনিষ্ঠ প্রেমের গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি না, বুঝলে ?

তোমার কাছেও আমি সে গ্যারান্টি চাই না। তুমিও আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারছ না। এটুকু শুধু ধরে নিচ্ছি। আমাদের বিয়ে হওয়াটাই আসল কথা। তুমি দুটাকা ভিজিটের ডাক্তার হয়ে জীবন কাটাতে চাইলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তুমি যদি আমার বাপের টাকায় বড়ো হতে অপমান বোধ কর, বিয়ে আমাদের ফসকে যাবে। কিন্তু এতে তোমার অপমান নেই। মেয়ের বিয়েতে টাকা বাবা খরচ করবেই। যার সঙ্গেই বিয়ে হোক। তোমার জন্য কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা হবে না।

এই অপমানের প্রশ্ন নিয়ে কেদার বিব্রত বোধ করে না। বাপের টাকায় বিলেত গিয়ে জীবনে উন্নতি করেছে বলে গীতা তাকে শ্রদ্ধা কম করবে, তার স্বামীত্বের অধিকার খর্ব করার সুযোগ পাবে—এ সব বাঁকা চিন্তা তার মনে আসে না। বউকে দখলে রাখার অধীনে রাখার সাধটা বাঁকা পথে ছদ্মবেশে যে তার মনেও আসে না তা নয়, বাস্তব যে সংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখেছে সমাজে অত সহজে ব্যক্তি তা থেকে একেবারে রেহাই পায় না। তবে এই সংস্কারের সঙ্গে জড়িত কতগুলি সাধারণ কুসংস্কারকে কেদার জয় করেছে।

বশীভূত ও বশংবদ স্বামী দরকার হবে, গীতার সম্বন্ধে এ ধারণা থাকলে তাকে বিয়ে করার কল্পনাও সে করত না।

না, গীতার বাপের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে নামকরা বড়ো ডাক্তার হতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই কেদারের—অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে প্রমথ একটা ডিসপেনসারি দাবি করবেই। গরিব ডাক্তার হয়ে থেকে বিনা পয়সায় গরিবের মেয়ে বিয়ে করে গরিবের সেবায় জীবন কাটিয়ে দেবার আদর্শ যদি কারও থাকে সেটা তারই থাক—ও রকম কোনো আদর্শ দিয়ে নিজেকে সে বাঁধেনি, বাঁধবার ইচ্ছাও পোষণ করে না।

অন্য ডাক্তার বাড়ি তুলবে মোটর হাঁকাবে আর সে কিছুই করবে না কতগুলি ফাঁকা নীতিবাক্যের খাতিরে, এই ত্যাগধর্ম সে গ্রহণ করেনি।

তার মনে খটকা লেগেছে অন্যদিক থেকে।

বড়ো হতে গেলে তাকে কী সম্পর্ক তুলে দিতে হবে যাদের সে মমতা করে তাদের সঙ্গে ? তাকে কী ভুলে যেতে হবে তাদের, যারা বড়ো হবার জন্য নয়, শুধু বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে শেষ হয়ে যায় ? এদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তার পক্ষে কী সম্ভব হবে বড়ো হওয়া, গীতাব জন্য বড়ো হওয়া, তার বাপের টাকায় ?

বড়ো হবাব প্রক্রিয়া কি তাকে রেহাই দেবে ? তাব বেলা আলগা কবে দেবে জীবনের এই শর্তগুলি ? বড়ো ডাক্তাব হয়েও সে-কি আপন হয়ে থাকতে পারবে এখনকার আপন মানুষগুলির ?

এতদিন তাব ধারণা ছিল তার মতো গরিব পরিবারের যে ছেলেরা নিজেব চেষ্টায় আই সি এস হওয়ার মতো কেউ একজন হয়, তাদের বাধ্য হয়েই নাড়ির সংযোগ কেটে ফেলতে হয় কেরানি মাস্টারদের স্তরের আগেকাব জীবনেব সঙ্গে, নইলে ও বকম বড়ো হওযাও যায না, বড়ো হওয়ার কোনো সার্থকতাও থাকে না।

কিন্তু ডাক্তার হওযা আলাদা কথা। ডাক্তাব লড়াই কবে মানুষের রোগের সঙ্গে। বড়োলোক বোগীর কাছে মোটা মোটা ফি নিয়ে টাকা করাও যেমন সম্ভব তার পক্ষে, গবিব আত্মীয়বন্ধুদের আপন থাকা আর বিনা ফিতে তাদেব চিকিৎসা কবাও তেমনি অসম্ভব নয।

আজকাল এ বিষয়ে রীতিমতো খটকা লেগেছে কেদাবের মনে।

এদিক ওদিক কযেক মিনিট পাযচারি কবে সে ঠিক চাবটের সময সবাব বড়ো শিক্ষাযতনেব মাঠের সামনে দাঁড়ায়। ক্লাস কবে গীতা এখন বেরিযে আসবে।

শিক্ষায়তন !

এ শিক্ষায়তনেব সঙ্গে তার পবিচয আছে। যেমন অভাগা দেশ, বিদেশের লোক এসে যে দেশের ঘাড় ভেঙে খায় পাঁচ-সাতপুরুষ ধরে, স্বাধীন কবে দিয়েও ঘাড় ভেঙে খাওয়াব জের টেনে যায়, সে দেশের যোগ্য শিক্ষাযতন।

শিক্ষা আর সংস্কৃতির একটা জমিদারি।

গীতার জন্যে ?

একটি মেযে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। মেযেটিকে চেনা মনে হয়।

কেদার বলে, হ্যাঁ।

গীতা তো আজ আসেনি।

ও !

গীতা কেন আসেনি কেদার জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল মেযেটি। জিজ্ঞাসা না কবেই তাকে চলে যেতে দেখে সে ডাকে, শুনুন ?

কেদার ফিরে এলে বলে, গীতাকে বাড়িতেও পাবেন না'

কেদার সবিনয়ে বলে, আমার কোনো জরুরি দরকার ছিল না। এমনি দেখা করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি হেসে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। সে জন্যেই ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একঘণ্টা। আপনারা সত্যি আশ্চর্য জীব। গীতাদের জন্য এখনও আপনারা ধন্না দিয়ে থাকেন—আজকের দিনেও !

আঙুল দিয়ে চশমাটা যথাস্থানে ঠেলে দিয়ে মেয়েটি মুচকে হেসে বলে, যাক গে, আপনাদের ব্যাপার আপনারা বুঝবেন। গীতা কাল দিল্লি গেছে। প্লেনে গেছে। আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেছে, আপনাকে জানিয়েও যায়নি ?

কেদার বলে, জানিয়ে যাবে কেন ? দরকার হয়েছে দিল্লি গেছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, জানিয়ে গেছে। আমাকে জানাবার সুবিধে ছিল না, তবু জানিয়ে যাবে কেন ?

এবার মেয়েটি হেসে বলে, আমাকে চিনতে পারেননি বুঝতেই পারছি। চিনলে একটু খোঁচা দিয়েছি বলেই চটতেন না। এ রকমভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার কিন্তু আছে।

চিনতে পারিনি সত্যি।

ভেবে দেখুন, যদি মনে পড়ে।

মেয়েটি হাসি মুখেই চলে যায়।

ভেবেও তখন কেদারের মনে পড়ে না। মনে পড়ে বাড়ি ফিরে অমলার দিকে চোখ পড়ামাত্র। ঠিক, অমলার সঙ্গে পড়ত মেয়েটি—নাম অঞ্জলি। তাদের বাড়িতেও অনেকবার এসেছে। অমলার পড়া বন্ধ হবার পর শেষ হয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্ব। অমলাকে যদি পড়ানো যেত, তাকে ডাক্তার করার জন্য যদি না বলি দিতে হত অমলার লেখাপড়া—এই মেয়েটির সঙ্গে সেও আজ যাতায়াত করত ওই শিক্ষায়তনে।

শিক্ষায়তনটি কেদারের কাছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জমিদারি মাত্র, অথচ তার জন্য বোনটির ওখানে যাতায়াতের সুযোগ জুটল না বলে কেদার আপশোশও করে !

তাকে না জানিয়ে গীতা হঠাৎ দিল্লি চলে গেছে।

এ জন্য রাগ বা অভিমানের বদলে কেদার উৎকণ্ঠা বোধ করে। বিশেষ কাবণ না ঘটে থাকলে এ ভাবে গীতা নিশ্চয় প্লেনে দিল্লি ছুটে যায়নি।

কী হয়েছে জানা দরকার।

সোজা সে চলে যায় ডাক্তার পালের বাড়ি।

গীতার মা উদাসভাবে বলে, গীতা ? সে কাল দিল্লি গেছে।

হঠাৎ দিল্লি গেল কেন ?

এমনি কাণ্ডই তো করে। ওর কোন বন্ধুর নাকি খুব অসুখ। টেলিগ্রাম পেয়েই পাগলের মতো ছুটে গেছে। আজকালকার মেয়েরা বন্ধুত্বও করে বটে সত্যি !

গীতার মার রং খুব ফরসা। যাকে বলে দুধে আলতা রং প্রথম বয়সে বোধ হয় সেই রকম ছিল, আজকাল খানিকটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সর্বদাই তাকে শ্রান্ত আর উদাসীন মনে হয়। মেয়ের জামাই হলেও হতে পারে কেদার একদিন, হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলাব বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যায় না গীতার মাব।

কেদারকে অপছন্দ করে বলে নয়। ভাবটা তার অবজ্ঞা বা বিরক্তির নয। সব বিষয়েই তার এই উদাসীন ভাব। মেয়ের জন্য ছেলে পছন্দের দায়িত্ব মেয়ে আর মেয়ের বাপের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে।

ও, হ্যাঁ, গীতার মা হঠাৎ বলে, তোমার জন্য একখানা চিঠি রেখে গেছে। পাঠিয়ে দিতে একেবারেই ভুলে গেছি।

এতক্ষণে বিব্রত বোধ করার ক্ষীণ একটু হাসি ফোটে তার মুখে।

শরীরটা ভালো থাকছে না কিছুতেই।

এটা হল কৈফিয়ত। গীতা যে চিঠিখানা রেখে গিয়েছিল কেদারকে সেটা পাঠাতে ভুলে যাবার কৈফিয়ত।

তবে কৈফিয়তটা একেবারে মিথ্যাও নয় গীতার মার। শরীরটা তার সত্যই ভালো নয়। কিন্তু কী অসুখ বিখ্যাত ডাক্তার পালের স্ত্রীর, কোথায় খুঁত ধরেছে তার এই দেহযন্ত্রে ? এদিকে কি নজর পড়ে না ডাক্তার পালের ?

ডাক্তারি শিখতে শিখতে সেও যেমন দেখতে পায়নি তার মার দেহযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে, এত বড়ো ডাক্তার হয়ে ডাক্তার পালেরও কি তেমনি চোখে পড়ে না ঘরের মানুষটার দেহের অসুস্থতা ?

গীতার চিঠি পড়ে কেদার বুঝতে পারে তার দিল্লি ছুটে যাওয়ার কারণ। গীতার যে একজন প্রাণের চেয়ে প্রিয় মেয়ে বন্ধু ছিল তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। বরাবর কলকাতাতেই থাকত রেখা, কিছুদিন আগে তার বাবা মস্ত সরকারি চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে যায়।

সেখানে রেখার হঠাৎ কঠিন অসুখ হয়েছে।

কী অসুখ সেটা অবশ্য গীতা চিঠিতে লেখেনি।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে এখন বিশেষ এক গভীর মমতা বোধ করে কেদার। গীতাকে সে যে ভালোবাসে সেটা আরেকবার নতুন করে যেন অনুভব কবে। যাকে ভালোবাসে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসার যে ক্ষমতা সে দেখেছে গীতার, আজ তার আরেকটি পরিচয় পাওয়া গেল।

ফিরবার সময় বাইরের ঘরে নার্স অণিমার সঙ্গে দেখা হয় কেদারের। হয়তো সে এখানেই বসেছিল, ভেতরে যাবার সময় লক্ষ করেনি।

নমস্কার কেদারবাবু। ভালো আছেন ?

হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে অণিমা পরিপূর্ণ প্রণাম জানায়।

কেদারের সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় অণিমার। কিন্তু দেখা হলে তাকে এমন খুশি মনে হয় যেন অনেকদিনের হারানো আত্মীয়কে ফিরে পেয়েছে।

অণিমার সীমাহীন বিনয় আশ্চর্য করে দেয় কেদারকে। অস্বস্তিও বোধ করে।

শুধু তার মুখের কথায় মুখের ভাবে নয়, সর্বাঙ্গের সমস্ত ভঙ্গিতে যেন একটা স্থায়ী সবিনয় কারুণ্য। মানুষ যেন বেচারিকে দয়া করে একটা পেশা অবলম্বন করতে দিয়ে সকলের দাসী বানিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার পালের জন্য অপেক্ষা করছেন ?

হ্যাঁ। একটু কাজ আছে। ওঁর ফিরতে দেরি হলেই মুশকিলে পড়ব। ওদিকে আবার ডিউটি আছে।

একটু বসুন না কেদারবাবু ? তাড়া নেই তো ?

না, তাড়া কিছু নেই।

একটু অপেক্ষা করলে ডাক্তার পালের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে মনে করেই কেদার বসে বটে, কিন্তু অণিমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাও যে তার থাকে না তা নয়। নার্সদের জীবন সম্পর্কে তার বিশেষ একটা কৌতূহল আছে।

নার্সরা তার একেবারে অজানা মানুষ নয়। হাসপাতালে অনেক নার্সকেই সে দেখেছে, তাদের কাছাকাছি এসেছে। কয়েকজনের সঙ্গে মোটামুটি আলাপও হয়েছে। কিন্তু সে পরিচয় শুধু ডিউটিরত নার্সদের সঙ্গে—তারা যখন চাকরি করছে, কর্তব্য পালন করছে।

ডিউটির বাইরে ওদের একজনেরও জীবনের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়টুকুও নেই।

অণিমা বলে, একদিন চা খেতে আসুন না আমার বাড়িতে ? আমার স্বামী খুব খুশি হবেন আলাপ হলে।

সত্যিই মমতা বোধ করে কেদার। অণিমা যেন ঘোষণা করে যে এমনি দশা আমাদের, এমনি একটা জগতের সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হয় যে একজন পুরুষকে বাড়িতে চা খাবার নেমন্তন্ন করলে জানিয়ে দেওয়া এখনও আমি দরকার মনে করি, ভয় নেই, অন্য কিছু ভাববেন না দয়া করে, ঘরে আমার স্বামী আছেন, স্বামী নিয়ে ঘর করি আমি !

স্বাধীন পেশা নিয়েও অণিমারা যে কত অসহায় কেদার তা জানে।

আপনার স্বামী কী করেন ?

কাজ করতেন। এ বছর ছাঁটাই হয়ে ঘরে বসে আছেন।

সে নিজেই যেন দায়ি এমনি ভাবে অণিমা যোগ দেয়, যে দিনকাল। মানুষের কাজকর্মও থাকছে না।

অণিমাকে দেখলে মনে হয় যৌবনের মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেলেও সবেমাত্র পার হয়েছে। এখনও সীমানায় পৌঁছতে দেরি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপরাহ্ণ এসে গিয়েছে তার যৌবনের, ঘনিয়ে আসছে ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

তার বয়স কম দেখাবার প্রাণপণ চেষ্টার যে মানেই অন্য লোকে করুক, কেদাব জানে এ শুধু তার পেশা বজায় রেখে চলার প্রয়োজনকে খাতির করা।

আপনার ছেলেমেয়ে নেই ?

একটি মেয়ে।

আচ্ছা, আপনার সংসারের কাজ রান্নাবান্না এ সব কে করে ? লোক রেখেছেন ?

লোক কী রাখা যায় কেদারবাবু ! ওনার যখন চাকরি ছিল তখনই পারতাম না, আজ কোত্থেকে পারব ? বাড়ি থাকলে সে বেলা আমি রাঁধি। অন্য বেলা উনি চালিয়ে দেন।

কেদারের সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় হলেও তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তার আগ্রহ ও প্রশ্নের সঙ্গে অণিমার অনেককালের পরিচয়। কেদারের মতো এমন কত তরুণ ডাক্তারকে সে এই রোগজীর্ণ নিপীড়িত মানবতার মুক্তিদাতা হয়ে কর্মজীবনে নামার অনুপ্রেরণায় ডগমগ হয়ে থাকতে দেখেছে। এমনি সাগ্রহে তাদের কত প্রশ্ন করতে শুনেছে চিকিৎসকদের সহকর্মিণী নার্সদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে !

কয়েক বছর পরে এরাই আবার জীবনে একটিমাত্র আদর্শ খাড়া রাখে সামনে, বোগী বাড়ুক, পসার বাড়ুক, ফি বাড়ুক।

ক্ষমতা হাতে পেলে এরাই নিষ্ঠুর অবিবেচনার সঙ্গে নার্সদের কাছে দাবি কবে নিখুঁত দায়িত্বজ্ঞান সময়জ্ঞান তৎপরতা।

কেউ কেউ অন্য দাবিও কবে।

৪

পরিমলের গরদের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, তাঁতের ধুতি, তার ওষুধের দোকানে দামি আসবাব, নতুন সুদৃশ্য সাইনবোর্ড—এ সব সত্যই তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার !

বাইরের লোকের কাছে না হোক, যারা তার ও তার বাড়ির অবস্থা জানে তাদের কাছে তো বটেই।

হঠাৎ এত পয়সা সে পেল কোথায় ?

পয়সার অভাবেই যার কেদারের চেয়ে ভালো ছাত্র হয়েও ডাক্তারির বদলে কবিরাজি শেখা, কোনোরকমে পুরানো একটা চেয়ার টেবিল, ফরাশ পাতা তক্তপোশ এবং ভাঙা একটা আলমারি নিয়ে দোকান খোলা, হঠাৎ সব এ ভাবে বদলে দেবার সঙ্গতি সে জোটালো কী করে ?

বিয়ে তো করেনি বা বিয়ের সব ঠিক হয়ে যাওয়ায় আগাম কিছু পণ তো আদায় করেনি ভাবী শ্বশুরের কাছে !

পরিমলের বেশ ও দোকানের বাহ্য পরিবর্তনের সঙ্গে জ্যোতিরও একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে দেখা যায়।

তার অস্থির উগ্র মরিয়া ভাব দিন দিন সত্যই বড়ো অশোভন হয়ে উঠেছিল। শুধু তার আপনজনেরা নয়, কেদারও রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

অন্যভাবে ভালোবাসতে না পারুক, বিয়ে করা সম্ভব না হোক, ছেলেবেলার সাথি মেয়েটার জন্য তার আন্তরিক স্নেহ ছিল, নিজের বোনটি ছাড়া কারও জন্য এ স্নেহ পোষণ করতে না পারার মতো অনুদার সে নয়।

জ্যোতির জন্য কিছুই করতে না পারার অক্ষমতায় সে গভীর দুঃখ বোধ করেছে। যার চাপে হর্ষকে পরিমলের কথা বলতে গিয়ে সে ধমক খেয়েছিল।

সত্য কথা বলতে কী, নিজের এই নিরুপায়তা তাকে বারবার তিক্ততার সঙ্গে মনে পড়িয়ে দিয়েছে যে এই জন্যই সংসারে মানুষ অনুদার হওয়া ভালো মনে করে, যার জন্য কিছু করার অধিকার নেই তাকে স্নেহ করতে গিয়ে মনঃকষ্ট বরণ করে না, স্নেহমমতা রিজার্ভ করে রাখে নিজের বাড়ির নিজের লোকের জন্য।

তাও কার উপর কতটা অধিকার ঘটাতে পারা যাবে তারই হিসাব অনুসারে।

জ্যোতিকে হঠাৎ শান্ত হয়ে জুড়িয়ে যেতে দেখে, তার চোখে মুখে রহস্যময় হাসিখুশির ভাব ফুটতে দেখে, কেদার তাই প্রথমে পরম স্বস্তি বোধ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, কী এমন অঘটন ঘটে গেল যে জ্যোতির আর ভাবনা চিন্তা রইল না, মুখ থেকে হতাশার ছাপ মুছে গিয়ে আনন্দের জ্যোতি দেখা দিল ?

পরিমলের সম্পর্কে কি মত বদলে গেছে বাড়ির লোকের ? হর্ষ ডাক্তার কি অগত্যা মেনে নিয়েছে যে কবিরাজও মানুষ ?

অমলাকে সে জিজ্ঞাসা করে, জ্যোতির সঙ্গে মিশিস না কেন তুই ?

ও মেয়ের সঙ্গে কে মিশবে ?

মেয়েটা খারাপ হল কীসে ?

মেয়েটা খারাপ নয়। মেয়েটার মাথাটা খারাপ। এতদিন ধিঙ্গিপনার শেষ ছিল না, লজ্জাশরম নেই বাছবিচার নেই, যা তা করছে যা তা খাচ্ছে। মেয়ে হঠাৎ আবার ডিগবাজি খেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। মাছ মাংসের ছোঁয়া খায় না, বউদির সঙ্গে নিরামিষ খায়, ভোরে উঠে চান করে, পুজো করে, আরও কত কী !

সেদিনের পর থেকে কেদার আর জ্যোতিদের বাড়ি যায়নি। ধীরে ধীরে তার সম্পর্কে পরিমলের যে অবজ্ঞা আর বিদ্বেষের ভাব স্পষ্টতই বেড়ে চলছিল সেটাকে উসকানি দেবার সাধ তার ছিল না।

এবার একবার নিজের চোখে দেখে শুনে ব্যাপার বুঝতে যায়।

ইতিমধ্যে জ্যোতি কয়েকবার দুপুরবেলা সেই সময় তাদের বাড়ি এসেছে। তখন সে লক্ষ করেছে জ্যোতির নতুন ভাব। কিন্তু কথাবার্তা সে ইচ্ছা করেই বেশি বলেনি তার সঙ্গে।

জ্যোতিরও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি আলাপ করবার। বাড়িতে একবার তাকে দেখে আসা দরকার।

মোহিনী সখেদে বলে, মেয়েটা আবার আরেক পাগলামি জুড়েছে বাবা। বাপের আদরে চুলোয় গেল হারামজাদি। এত বাড়াবাড়ি করছে, বাপকে বললাম একটু শাসন করো, তা বলে কি না, ভালোই তো !

বিয়ের কিছু ঠিক হল ?

কই আর হল বাবা ? ও মেয়ের আর বিয়ে হয়েছে ! কোথা থেকে একটা অলক্ষ্মী এসে জন্মেছিল।

বিধবা রেবা মাছ কাটছিল। সে বলে, এ কী বাড়াবাড়ি মাগো ! মাছ না খাও না খেলে, আমিও তো খাই না। তাই বলে মাছ ছুঁতেও দোষ ? মাছটা কেটে দিতে বললাম, শিউরে উঠে ঘর লেপতে গেলেন। সকালে একবার লেপা হয়েছে, আবার কী দরকার তোমার ঘর লেপার ?

কেদার ঘরে যায়।

জ্যোতির কপালে চন্দনের ফোঁটা।

সে বলে, জেরা কোরো না, উপদেশ দিয়ো না কেদারদা।

কেদার বলে, বেশ তো। ব্যাপারটা আমায় খুলে বলো ! আগে বেহায়ার মতো বলেছ, আজ লক্ষ্মী মেয়ের মতো বল।

জ্যোতি একটু হেসে বলে, অভ্যাস করছি।

তার মানে ?

তাও বুঝলে না ? আরেক জনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে তো একদিন। বিবিয়ানা পছন্দ করে না মানুষটা।

কেদার অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এমন নির্ভয় নিশ্চিন্ত বিশ্বাস এসেছে মেয়েটার যে একদিন তাকে পরিমলের ঘর করতে হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না ?

পরিমলের কথা কি মোহিনী তার কাছে তবে গোপন করে গেল ?

হর্ষকাকা রাজি হয়েছেন ?

হননি। হবেন।

কেন হবেন ?

জ্যোতি রাগ করে বলে, সেই জেরাই তুমি শুরু করলে। চিরদিন তোমার এই একভাব—

আমি তোর মঙ্গল চাই জ্যোতি।

এত মঙ্গল কি মানুষের সয় ?

তোর সইবে।

পসার বাড়ছে, ওষুধ বিক্রি-বাড়ছে। এক বছরে মোটর কিনবে দেখো। তখন আর আপত্তি করবে কেন তোমরা ? বাবা নিজেই বলবে, নাঃ, ভালো পাত্র পেয়েছি।

কেদার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তুই টাকা কোথায় পেলি জ্যোতি ?

টাকা ?

পরিমলকে তুই টাকা দিয়েছিস।

মুখ কালো করে জ্যোতি বলে, তুমি পাগল নাকি ? আমি টাকা কোথায় পাব ?

খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে কেদার তার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর নীরবেই বিদায় নেয়।

ওর জন্য কিছু করবার অধিকার শুধু তার নেই নয়, আজ টের পেয়েছে যে কিছু করার ক্ষমতাও তার নেই।

এও তো তপস্যা ! পদ্ধতিটা যেমন হোক।

কিছুতেই হাল ছাড়বে না জ্যোতি। দিবারাত্রি তার আর কোনো চিন্তা নেই, জীবনে আর কোনো কামনা নেই, সাধ আহ্লাদ সব দাঁড়িয়ে গেছে যে ভাবে হোক তার প্রেমকে সফল করার চেষ্টায়।

পরিমলকে সে বদলাতে চায় না, নিজে বাপের ঘরে কী ভাবে মানুষ হয়েছে শিক্ষাদীক্ষা কী পেয়েছে এ সব নিয়ে সে মাথা ঘামায় না—পরিমল যেমন চায় তেমনি হবার জন্য সে প্রস্তুত এবং উন্মুখ !

কেদার অবশ্য তার মানে জানে। কোনোদিন চোখে না দেখলেও বাপভাই যাকে এনে জুটিয়ে দেবে তার কাছেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ যে মনের ধর্ম এবং সেটাই যে মনের প্রেম, জ্যোতি নিজে বর বেছে নিয়ে নিজে তোড়জোড় কবে বিয়েটা ঘটাবার চেষ্টায় প্রাণপাত করলেও এ প্রেম আলাদা কিছু নয়, এও সেই একই মানসিক ধর্ম পালন। বিয়ে হবার পর স্বামীকে পছন্দ হলে যা ঘটে, জ্যোতির বেলা বিয়ে হবার আগেই সেটা ঘটেছে।

মানে সে জানে। জানে যে এ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়—ঘরে ঘরে মেয়েদের দাসীত্ব যে আত্মসমর্পণের ভিত্তি।

কিন্তু এ কি প্রেম নয় জ্যোতির ?

প্রেম শুধু ঘটেছে তার ও গীতার মধ্যে ? গীতা নিজেকে লোপ করতে রাজি নয়, সমানভাবে স্বাধীনভাবে নিজের রুচি ও পছন্দসই জীবন সে যাপন করবে তার সঙ্গে—নিজেকে সমর্পণ করবে না।

সত্যই কি করবে না ?

জ্যোতির মতো গীতাও কি চাইছে না তার প্রেম সফল হোক বাপের সম্মতিতে, তার পছন্দ মতো নীড়ে তার পছন্দ মতো দাম্পত্য জীবনে ?

জ্যোতিও তো অবিকল তাই চায়। দুজনের তফাত শুধু মনের গড়নের, পছন্দের।

তাছাড়া, সে বড়ো ডাক্তার হয়ে উপার্জন করবে আর সেই উপার্জন ভোগ করেও সত্যই কি স্বাধীন সত্তা বজায় থাকবে গীতার ?

পরিমল যেমন চায়, জ্যোতি চলবে ফিরবে সেইভাবে।

সে যেমন চায় গীতাও চলবে ফিরবে সেইভাবেই।

না বলে জ্যোতির পাড়ার কোনো বান্ধবীর বাড়ি যাওয়া নিয়ে পরিমল মাথা ঘামাবে না।

না বলে গীতাব দিল্লি চলে যাওয়াব মধ্যে সে দোষের কিছু খুঁজে পাবে না।

পার্থক্যটা তুচ্ছ নয়, সামান্য নয়।

নিজেকে সব রকমে সঁপে দিয়ে গীতা জ্যোতির মতো শুধু তাকে আর রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরকে অবলম্বন করে জীবন কাটাবে ভাবলেও তাব গা ঘিনঘিন করে।

কিন্তু আজ এ কী মুশকিলেই যে সে পড়ে গেল ! তবে কেন তার বারবাব মনে হচ্ছে যে জ্যোতির মতো গীতাও যদি পাগল হয়ে উঠত, তাকে পাওয়ার জন্য জ্যোতির মতো সেও যদি মরিয়া হয়ে উঠত !

নিজের মনটা তার নিশ্চয় পিছিয়ে আছে।

সে নিশ্চয় মনে মনে চায় যে সে বড়ো হোক বা না হোক, ডাক্তার পালের টাকায় বিলাত ঘুরে এসে দ্বিতীয় ডাক্তার পাল হোক বা না হোক, তাকে পাবার জন্য গীতা সব কিছু করতে রাজি আছে !

সে চিকিৎসক। রোগ নির্ণয় তার পেশা। জ্যোতির কোনো রোগ হয়নি। কিন্তু ডাক্তারি চোখ দিয়ে জ্যোতিকে দেখতে যে খটকা লেগেছে তার মনে তা যদি সত্য হয়, এ সমাজে কুমারী মেয়ের পক্ষে সেটা মারাত্মক রোগের চেয়ে বড়ো অভিশাপ।

তবু এক বছর দেড় বছর পরে পরিমল বড়োলোক হবে, হর্ষের মত বদলাবে এই আশা পোষণ করছে জ্যোতি ! বছরখানেকের মধ্যে পরিমল পসার বাড়াবে টাকা করবে মোটর কিনবে—কারও আপত্তি থাকবে না তার হাতে জ্যোতিকে সঁপে দিতে।

জ্যোতি নিজে কি টের পায়নি ?

অথবা সেই কি ভুল করেছে ?

দুপুরে আসত জ্যোতি সকলের বিশ্রামের সময়ে। দু-একটা কথা বলেই সে উপরে চলে যেত।

কেদার বাইরের ঘরে একটা পুরানো আলমারিতে কিছু ওষুধপত্র নিয়ে, আগেকার টেবিলটাতেই একখণ্ড রঙিন কাপড়ের আবরণ চাপিয়ে তার নতুন কেনা ডাক্তারি ব্যাগ স্টেথোস্কোপ চাপিয়ে রাখে। এই ঘরেই সে শোয়া-বসার ব্যবস্থা করেছে।

তা আগেও সে এই ঘরেই শুয়েছে বসেছে পড়াশুনা করেছে, তবে আগে ঘরখানার দখলিস্বত্ব তাকে কেউ এমন সর্বাঙ্গীণ ভাবে ছেড়ে দেয়নি।

দু-একজন রোগী আসে। দু-চার টাকা পাওয়া যায়। তাতেই খুশি হয়ে প্রমথ এ ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনোরকমভাবে ঘরখানা ব্যবহার করা নিষেধ করে দিয়েছে।

রাত্রি শেষ হবে। শুকতারা দপদপ করে জ্বলছে নিভবার জন্য। দরজায় মৃদু করাঘাত আর চাপা গলার ডাক শুনে তরল ঘুম ভেঙে যায় কেদারের।

কে ?

দরজা খোলো কেদারদা। আমি জ্যোতি।

কেদার দরজা খুলে দিতে সে ঘরে ঢুকে কেদারের বিছানাতে বসে। বলে, বড়ো বিপদে পড়েছি। আমি কিন্তু হাতে পায়ে ধরব না কেদারদা।

খুলেই বল না ? সহজভাবেই?

চা-টা খেয়েই বাবা তোমার বন্ধুকে খুন করতে আসবে।

কেদার তার ভাঙা আলমারিটা খুলতে খুলতে বলে, কাঁপছিস কেন ? এই তো দোষ তোদের ! মরি-বাঁচি করে সারাবছর তিলে তিলে প্রাণ দিবি, যখন মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তখন আর গায়ে জোর খুঁজে পাবি না।

আলমারি খুলে বোতল থেকে ওষুধ মাপা গ্লাসে ওষুধ ঢেলে তাতে আরেকটা বোতলের ডিস্টিল ওয়াটার খানিকটা মিশিয়ে দিয়ে কেদার বলে, এক চুমুকে গিলে ফ্যাল। তারপর কথা হবে।

বাবার ওষুধ দিলে ? ব্র্যান্ডি দিলে ?

কেদার ধমক দিয়ে বলে, তোর বাবা ওষুধ খেয়ে নেশা করে। তার জন্যে কি ওষুধও বিগড়ে যাবে নাকি ?

একটু ইতস্তত করে এক চুমুকে ওষুধটা গিলে ফেলে মুখ বিকৃত করে জ্যোতি কয়েক মুহূর্ত ঘন ঘন নিশ্বাস নেয়।

তারপর ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলে, তুমি আমায় ওষুধ খাইয়ে ঝিমিয়ে দিলে। যেভাবে বলতে এসেছিলাম সেভাবে আর বলতে পারব না।

সেই তো ভালো। ঝোঁকের মাথায় আবোল-তাবোল বলার চেয়ে এবার গুছিয়ে বলতে পারবি। সারারাত ঘুমোসনি, না ?

জ্যোতি মাথা নাড়ে।

বাড়ি গিয়ে ঘুমোবি।

তাই ঘুমোতে হবে। আর যাতে না জাগি এমনিভাবে।

তবে এলি কেন আমার কাছে ? ও ভাবে ঘুমোলেই হত !

এলাম কেন ? তুমি বলো কি না আমার ভালো চাও, তাই দেখতে এলাম সত্যি যদি ভালো করতে পার।

জ্যোতি মুখ তুলে সোজা তাকায়। মুখ তার থমথম করছে ভেতরের পুঞ্জীভূত আবেগ উদ্‌বেগ আর উত্তেজনায়।

ভয়ের কিন্তু লেশটুকু নেই মুখের ভাবে !

তুমি ঠিক ধরেছিলে কেদারদা। আমিই টাকা দিয়েছিলাম। মার নামে বাবা সার্টিফিকেট কিনে দিয়েছিল, চুরি করে নিয়ে ভাঙিয়েছিলাম। কাল সবাই জেনে গিয়েছে।

কী করে জানল ? সেই কবে চুরি করেছিলি, অ্যাদ্দিন পরে কাল মোটে ধরা পড়ল। তুই চুরি করেছিস জানল কী করে ?

আমি বললাম।

তোকে সন্দেহ করল কীসে ?

সন্দেহ করেনি। আমি নিজেই বললাম।

কেদার আশ্চর্য হয়ে যায়। সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না জ্যোতির কথায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, জ্যোতি, শুধু ব্যাপার খুলে বললেই চলবে না। তোর মনের ভাবটাও আমি জানতে চাই। মানুষ একটা কাজ করেছে সেটাই সব নয়। কেন করেছে কী উদ্দেশ্য নিয়ে করেছে সে সবও জানতে হয়।

তুমি তো জানই সব।

না, আমি জানি না। লুকিয়ে নিয়েছিলি, কেউ টের পায়নি। তোকেও সন্দেহ করেনি। কাল যখন জানা গেল সার্টিফিকেটগুলো নেই, যেচে তুই বলতে গেলি কেন তুই নিয়েছিস, পরিমলকে টাকা দিয়েছিস ?

জ্যোতি এবার মাথা নামায়।

ধীরে ধীরে বলে, না জানিয়ে উপায় ছিল না। আমি যা ভেবেছিলাম তা তো হল না। আর দেরি করার উপায় নেই। কদিন ধরে আমি পাগলের মতো ছটফট করছি। মা বাক্সো খোলে না, টেরও পায় না। আমিই শেষে বাক্সের তালাটা খুলে রেখে মাকে বললাম, দেখো তো মা তালা খোলা কেন, কিছু চুরি গেছে নাকি। বাক্সো খুঁজে দেখে মা আমায় বলল, তুই নিশ্চয় লুকিয়ে রেখে তামাশা করছিস। আমি তখন কাঁদতে লাগলাম। তারপর সব খুলে বললাম।

এ অবস্থাতেও তার বলার কায়দা কেদারকে মুগ্ধ করে দেয়। জ্যোতি নিছক কেবল কাহিনিটাই বলছে কিন্তু তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে বাড়ির মানুষকে তার জানিয়ে দেবার তাগিদ যে সে-ই ঘরের টাকা চুরি করে পরিমলকে আয় বাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। তার এ তাগিদের আসল মানেও উঁকি দিয়ে গেছে তার বলার মধ্যে।

কেদার বলে, সব খুলে বলেছিস ? সব ?

জ্যোতি একটু মাথা নাড়ে।

পরিমলকে বলেছিস ?

এবারও জ্যোতি মাথা নাড়ে।

হর্ষ কাকা তবে ওকে খুন করতে আসবে কেন ?

আমায় ভুলিয়ে টাকাটা নিয়েছে বলে। আমি নাকি ছেলেমানুষ, আসল দোষী ও। সত্যি বলছি কেদারদা, ওর কোনো দোষ নেই, সব বুদ্ধি আমার, আমিই সব করিয়েছি। আমায় বরং বারবার বারণ করেছে, রাগারাগি করেছে ধমক দিয়েছে—আমি জোর করে সব করিয়েছি।

সব তোর বুদ্ধি ? সব ? কোনো বিষয়ে ওর দোষ নেই ?

এবার জ্যোতি মাথা নামায়।—না।

বাজে বকিস না জ্যোতি। পরিমলের কাণ্ডজ্ঞান নেই, ও মানুষ নয় ? তুই তো সত্যিই ছেলেমানুষ। নিজে অমানুষ না হলে তাকে নামানো যায় না।

জ্যোতি মৃদুস্বরে বলে, যায়, তুমি জানো না। আমায় খালি ছেলেমানুষ ভাবছ। ঘরে খিল দিয়ে তোমায় আটকেছিলাম, ভুলে গেছ ? আমার সঙ্গে পেরে ওঠেনি, করবে কী ?

জ্যোতি মুখ তোলে। জোর দিয়ে বলে, সত্যি বলছি কেদারদা, বিশ্বাস করো। তুমিও যদি বিশ্বাস না করতে পার, কে করবে ? আমায় ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দিয়ো না। আমাকে ঠেকাতে কতভাবে কী চেষ্টা যে করেছে জানলে তুমি বুঝতে পারতে। সত্যি বলছি, প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমার সঙ্গে পারেনি। সামনে একদিন বিষ নিয়ে গিলে ফেলেছিলাম, আমি যা বলব শুনবে কথা দিয়েছে তবে বমি করতে রাজি হয়েছি।

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

এ উন্মত্ততা—উগ্র প্রচণ্ড ঝোঁক, যার কাছে জগৎ সংসার সব তুচ্ছ হয়ে যায়। একটা মানুষের জন্য এমন ভাবে উন্মাদিনী হতে পারে কোনো মেয়ে ?

তুই যে এমন করলি, তোর ওপর মানুষটার যে বিতৃষ্ণা আসবে ভাবলি না একবার ? তোকে শ্রদ্ধা করতে পাববে কখনও ? চিরদিন তোকে নিচু মনে করবে।

জ্যোতির মুখে ক্ষীণ হাসি ফোটে।

তুমি ঠিক উলটোটা বলছ কেদারদা। যার জন্য চুরি কবলাম সে কখনও চোব বলতে পারে ? পুরুষ মানুষ নিজে উপায় করতে পারল না, আমি যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করেছি—নিজের কাছেই তো লজ্জা পাবে ! ছোটো ভাবতে হলে নিজেকে ভাববে, আমাকে নয়।

হর্ষ কাকা ওঠেননি ?

বাবার উঠতে সেই বেলা সাতটা আটটা।

আচ্ছা তুই বাড়ি যা। গিয়ে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকবি।

জ্যোতি তবু নড়ে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মতো। চোখে পলক পড়া আব আঙুলের নড়াচড়া শুধু প্রমাণ দেয় হঠাৎ সে চেতনাহীনা সত্যিকারের পুতুল বা প্রতিমূর্তিতে পবিণত হয়নি।

কেদার সহজভাবে বলে, অনেক কাণ্ড করেছিস, তোর আর কিছু করার নেই জ্যোতি। আমাদের ওপর নির্ভর করে এবার তোর হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ থাকার পালা। সত্যি বলছি, আর কোনো বুদ্ধি খাটিয়ো না, কিছু করতে যেয়ো না, তাতে খারাপ হবে।

তুমি ভার নিলে ? সত্যি নিলে ?

নিলাম।

তবে যাই। আমার কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে কী জানো—

মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করে বলতে না পেরে জ্যোতি একটু হাসবাব চেষ্টা করে।

সে চলে যাবে, কেদার ডেকে বলে, আরেকটা কথা শোনো।

বলো।

কোনো কারণে যদি এখুনি ব্যবস্থা না হয়, যদি ছ-মাস এক বছর দেরিও করতে হয়—

কেদারদা !

ঝিমিয়ে নেতিয়ে এসেছিল জ্যোতি, আবার সে সচকিত হয়ে ওঠে।

কেদার শান্তভাবে বলে, যদির কথা বলছি। তোর জেনে রাখা ভালো। আমি ডাক্তার, কেমন ? আমি তোকে কথা দিচ্ছি, কোনো কারণে যদি অপেক্ষা করতেই হয়, তোর কোনো ভয় নেই। আমি তোকে দায় থেকে রেহাই পাইয়ে দেব। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে ফেলিস না। তোর আবার বিষ গেলার অভ্যাস আছে।

তুমি পারবে তো কেদারদা ?

কেদার বলে, কেদারদা নয়—বল ডাক্তারবাবু, পারবেন তো ? আমি তোর অসুখ ঠিক ধরেছি, তোকে সারিয়ে দিতে পারব। মিছে ভাবিসনে।

জ্যোতি ফিরে এসে আবার বসে।

ঘুমে শ্রান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসছে, জোর করে চোখ মেলে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে, তুমি আজও আমায় চিনলে না কেদারদা। আমি বিষ গিলেছিলাম কি মরতে চেয়ে ? ও সব আমার ধাতে নেই। মরার কথা কোনোদিন ভাবি না আমি। কেন মরতে যাব ? এত বড়ো পৃথিবী পড়ে রয়েছে, আমার ঠাঁই হবে না কোথাও !

মুখ না নামিয়ে শুধু গলা একটু নামিয়ে বলে, তুমি যে রেহাই দেবে বললে, আমি তা চাই না। আমি কি একটা পাপ করেছি যে সে জন্য আরেকটা পাপ করতে যাব ? আমি যাকে বিয়ে করব ঠিক করছি, তাকে আমি বিয়ে করবই। তোমরা সবাই যদি চেষ্টাও করো তবু ঠেকাতে পারবে না। গোড়া থেকে এই পণ করেছি, নইলে কি ভাব ঝোঁকের মাথায় নষ্ট করেছি নিজেকে ? তেমন মেয়ে পাওনি আমায়।

কেদার কথা বলতে পারে না। এ তেজ সে কল্পনাও করেনি জ্যোতির মধ্যে।

মনে হয়, নিজেকে আর সমস্ত মানুষকে বুঝি সে ছোটো ভেবে এসেছে এতকাল।

জ্যোতি আবার বলে, ও মানুষটার জন্যেই মুশকিল। ওর খালি ঝোঁক নিয়মমতো সাধারণভাবে বিয়েটা হোক। পুরুত ডেকে বাবা আমায় সম্প্রদান করে দেবে, অন্যরকম বিয়েতে ওর সাধ মিটবে না। নইলে আমি এত সহ্য করতাম ভেবেছ ? যত নিরুপায় ভাবছ আমাকে—

জ্যোতি হঠাৎ থেমে যায়। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বলে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী বকছি সব তা ? না কেদারদা, আমি সত্যি নিরুপায়। আমার এ সব কথা শুনে তুমি যেন আবার চেষ্টা করতে ঢিল দিয়ো না।

জ্যোতি চলে যাবার পর কেদার অবাক হয়ে ভাবে যে এই জ্যোতি তার চোখের সামনে বড়ো হয়েছে !

সে ডাক্তার, ডাক্তার ! এই মেয়েকে সে অভয় দিতে গিয়েছিল দায় থেকে মুক্ত করার !

জীবনে সে কখনও এ ভাবে বিব্রত বোধ করেনি। চিকিৎসক হতে গিয়ে গোড়াতেই তাকে জানতে হয়েছে যে মানুষ কেবল দেহের রোগেই ভোগে না, সমাজের অনিয়ম আর জীবনের অনিয়মও রোগের মতোই মানুষকে ভোগায়। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় ভাসা ভাসা ভাবে অর্জন করা এই জ্ঞান যে তার কতদূর একপেশে আর যান্ত্রিক, জ্যোতির কাছে আজ তাকে সেটা বুঝতে হল।

জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। কে জানে এ অভিজ্ঞতা আবার যাচাই হবে কিনা জীবনে ?

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় মস্ত এক দামি গাড়ি। দামি জামাকাপড় পরা শৌখিনভাবে ঘষামাজা করা মাঝবয়সি একজন ভদ্রলোক নেমে আসে।

মুখে তার দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ।

কাকে চান ?

ডাক্তারবাবুকে—কেদারবাবুকে।

এত সকালে কেদার নামক ডাক্তারবাবুকে খুঁজতে এ রকম গাড়ি চেপে অপরিচিত ভদ্রলোকের আবির্ভাব অন্যদিন হলে কেদারকে খুবই আশ্চর্য করে দিত। ভাবত যে ডাক্তারি আরম্ভ করার আগেই তবে তার নাম ছড়িয়ে গেছে ! আজ সে মনে মনে বড়োই বিব্রত হয়েছিল, তাই প্রায় নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গেই কেদার বলে, বসুন।

তাতে যে ভদ্রলোকের কাছে ডাক্তার হিসাবে তার মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে এটা তার খেয়ালও হয় না !

ভদ্রলোক বসে। বসে ইতস্তত করে।

কেদার নিজেও বসে। তার কাছে এই বড়োলোক মানুষটির কী প্রয়োজন থাকতে পারে সে বুঝে উঠতে পারে না। ডাক্তার হিসাবেই তাকে কনসাল্ট করতে বা কল দিতে এসেছে এটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার মনে হয় তার। শহরে এত বড়ো বড়ো ডাক্তার থাকতে এ রকম একজন বড়োলোক মানুষ সামান্য সর্দিকাশির চিকিৎসার জন্যও তার কাছে আসবে না।

ভদ্রলোককে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কেদাব বলে, আমারই নাম কেদার।

আপনি নতুন পাশ করেছেন ?

কেদার সায় দেয়।

আপনার লাইসেন্স আছে তো ? মানে, কিছু মনে করবেন না, লিগালি সব কেসের ট্রিটমেন্ট করা, ডেঞ্জারাস অপারেশন এ সব—

কেদার মৃদু হাসে।

ভাববেন না। আমি পুরোপুরি ডাক্তার।

ভদ্রলোক আবার একটু ইতস্তত করে বলে, কথাটা কী জানেন, একটা কেস আছে। তাই আপনার কাছে এলাম।

কেমন খাপছাড়া মনে হয় ভদ্রলোকের কথাবার্তা আর হাবভাব। মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে কেদারের। এত সব বিখ্যাত ডাক্তার থাকতে তার কাছে এসে খবর নেওয়া তার লাইসেন্স আছে কিনা !

সে গম্ভীর হয়ে বলে, কেসটা কী ?

আমরা মোটা ফি দেব। একশো দুশো—যদি চান আরও বেশি দেব। একটু বিপদে পড়েছি।

ভদ্রলোক করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।

খুলেই বলুন না ব্যাপারটা কী ?—কেদার জোর দিয়ে বলে, আগে কেসটা কী বলুন, তারপর ফি-র কথা হবে।

অন্যায় ব্যাপার কিছু নয়।

তবে বলতে আপত্তি কী ?

আপত্তি কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা একটু গোপনীয়। একটি মেয়ের—মানে, মেয়েটি প্রেগন্যান্ট। মেয়েটির স্বাস্থ্য বড়ো খারাপ, আমরা আশঙ্কা করছি মেয়েটি হয়তো বাঁচবে না। আমরা চাই—

কেদার গম্ভীর হয়ে বলে, বুঝলাম। এটা গোপনীয় কেন ? একশো দুশো টাকা ফি-ই বা আপনাকে দিতে হবে কেন ? মেয়েটির স্বাস্থ্য সত্যই যদি খারাপ হয়, ডাক্তার যদি মনে করেন বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহলে নিশ্চয় তিনি দরকার মতো ব্যবস্থা করবেন।

লোকটি একটা আপশোশের আওয়াজ করে। বলে কী জানেন, মেয়েটির বিয়ে হয়নি। ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে বসেছে, চুপিচুপি ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিতে চাই। আপনাকে বরং তিনশো টাকাই দেব—

এই সময় সংযম ভেঙে পড়ে কেদারের। নতুন ডাক্তার, পশার নেই, টাকার অভাব—লোকটা এই সব হিসাব করে তার কাছে এসেছে ! নামকরা বড়ো ডাক্তারের কাছে যেতে সাহস পায়নি !

কেদার গর্জন করে বলে, বেরোন এখান থেকে।

মুখ লাল করে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ায়।

ডাক্তারির অভিজ্ঞতা তো কেদারের নেই। সংসারের অভিজ্ঞতাও কম। সে তাই রাগের চোটে বলে, আপনার গাড়ির নম্বর টুকে রাখলাম।

বেরিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ায়। দেখা যায় তার এতক্ষণের সকরুণ বিনয় একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

তাই নাকি ! তুমি ছোকরা আমায় জব্দ করবে ? বটে, বটে ! তোমার মতো ডাক্তার কিনে আমি পা টেপাতে পারি জানো ? গাড়ির নম্বর রাখতে হবে না—আমার নাম ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে সে কেদারের দিকে অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে দেয়।

কেদারের রাগ তাড়াতাড়ি কমে যায় কিন্তু জ্বালা কমে না। সে জানে ভদ্রলোকের হুমকি মিথ্যা নয়—কিছুই সে করতে পারবে না তার অন্যায় মতলব ঠেকাতে। লোকটার টাকার জোর আছে বলেই নয়, শুধু নীতির খাতিরে তার পক্ষে কিছু করা উচিতও হবে না। এতক্ষণে অজানা অচেনা মেয়েটির কথা তার মনে পড়েছে। ভিতরের ব্যাপার কিছুই না জেনে কিছু করতে যাওয়ার মানেই দাঁড়াবে শুধু তার নিজের গায়ের ঝাল ঝাড়া।

বড়োই ছেলেমানুষ মনে হয় নিজেকে। এত রাগ না করে মেয়েটিকে একবার দেখতে গেলেই হত। কোনো উপকার হয়তো করলেও করতে পারত তার।

কেদার ভাবছিল হর্ষের কাছে নিজেই যাবে না পরিমলকে তার খুন করতে আসার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করবে। ভাবতে ভাবতে হর্ষের কাছ থেকেই ডাক এল।

গিয়ে দেখা গেল সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে পরিমলকে খুন করার সাধ তার বিন্দুমাত্র নেই। গম্ভীর বিমর্ষ মুখে মানুষটা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে।

কেদার গিয়ে দাঁড়াতে মুখ তুলে না চেয়েই বলে, বোসো।

কেদারকে চা দিতে বলে সে নীরবে কাগজে চোখ বুলিয়ে যায়। তার ভাব দেখেই কেদার অনুমান করতে পারে যে জ্যোতির পক্ষ নিয়ে তার ওকালতি করার দরকার হবে না, হর্ষ নিজেই অবস্থাটা মেনে নিয়েছে।

সে আপস করবে।

কেদার স্বস্তি বোধ করে।

সেই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে হর্ষ ডাক্তারের মতো একরোখা লোক এত সহজেই হার মানল !

হয়তো সেও অনুমান করতে পেরেছে সব কিছুই। বুঝতে পেরেছে যে হার মানা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মুখ তুলে কাগজটা সরিয়ে দিয়ে আচমকা হর্ষ বলে, তোমার বন্ধুটির কাছেই জ্যোতিকে দিতে হয় কেদার। হারামজাদি খেপে গেছে। এমন বেয়াদব অবাধ্য মেয়ে আর দেখিনি।

কেদার বলে, আমিও এই জন্যই বলেছিলাম আপনাকে।

হর্ষ নীরবে মিনিট খানেক খবরের কাগজে চোখ বুলায়। বোধ হয় কথা বলার আগে নিজেকে সংযত করে নেয়।

তুমি একা কেন, বউমাও বলেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, এ শুধু ছেলেমানুষি। ওইটুকু মেয়ের এমন গুণ হতে পারে, এ রকম বিগড়ে যেতে পারে, বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন দেখছি হারামজাদির আর কোনো গতি নেই। কী করেছে জানো ? চুরি করে আমার হাজার তিনেক টাকা ওই নচ্ছারটাকে দিয়েছে।

ক্ষোভে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে হর্ষ। তারপর বলে, যাক্ গে, কী আর হবে। ওর যখন গেঁয়ো কবরেজটাকেই এত পছন্দ, তাই হোক। নিজেই বুঝবে।

সকালবেলা এমনিতেই হর্ষ বেশ খানিকটা স্তিমিত নিস্তেজ হয়ে থাকে। আজ তাকে খুব বিমর্ষও দেখায়। এক একটি সন্তান নানা কারণে বিশেষভাবে আদুরে হয় বাপের। জ্যোতির জন্য হর্ষের পিতৃস্নেহের পক্ষপাতিত্ব সকলেরই জানা ছিল।

মনে তার সত্যিই তাই ভয়ানক আঘাত লেগেছে। তার কাছে শুধুই পিতার অধিকার খাটাবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার দুঃখ নয়।

আচমকা সে বলে, আমারও দোষ আছে। আমিই আদর দিয়ে দিয়ে মাথা বিগড়ে দিয়েছি।

কেদার মৃদুস্বরে বলে, খুব তেজি আর একরোখা হয়েছে।

হর্ষ বলে, যাক গে, কী আর করা যাবে। আমি কিন্তু গিয়ে প্রস্তাব করতে পারব না কেদার। এ দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে। বিশেষভাবে এই জন্যই তোমায় ডাকিয়েছি। তুমি আমার ছেলের মতো, বিশু মারা যাবার পর থেকে—

তাও কেদার বোঝে। জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে জামাই করার আশা ছেড়েও হর্ষ ছাড়তে পারেনি, এদিক থেকেও তার মনে আঘাত লেগেছে।

কেদার বলে, আপনি ভাববেন না কাকা, আমিই আপনার হয়ে কথাবার্তা বলব।

হর্ষ বলে, একটা কথা। পরিমলকে জানিয়ে দিয়ো, পণের টাকা সে আগেই পেয়েছে। আমি আর একটি পয়সা দিতে পারব না। টাকাটা জ্যোতির বিয়ের জন্যই তোলা ছিল।

কেদার বলে, নিশ্চয়, আবার কেন টাকা দেবেন ? বিয়েটা তাড়াতাড়ি হলে তো আপনাব আপত্তি নেই কাকা ?

হর্ষ কাগজটা টেনে নিয়ে বলে, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই।

তেরো দিন পরে জ্যোতির পণ পূর্ণ হয়।

কেদার বলে, মিছেই তুই বাড়াবাড়ি করেছিস জ্যোতি। এত কাণ্ড করবার কোনো দরকার ছিল না। আরেকটু জোর করে বললেই হর্ষকাকা রাজি হয়ে যেতেন।

জ্যোতি হেসে বলে, হতেন না। তোমরা বলবে বাড়াবাড়ি কবেছি, প্রাগলামি করেছি। কিন্তু বাড়াবাড়ি না করলে কথাটা তোমরা গায়েই মাখতে না, ভাবতে একটু ছেলেমানুষি করছি। আমি জানি তোমাদের, এমনি করে বুঝিয়ে না দিলে তোমরা কিছুতে বিশ্বাস করতে না যে আমি মরব তবু ছাড়ব না।

তাই নাকি !

তা নয় ? তোমাদের অবশ্য দোষ নেই কেদারদা। তোমরা দেখেছ, অনেক মেয়েই এ বকম ছেলেমানুষি করে, আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে দিলেই সব সেরে যায়। আমি যে সত্যি সত্যি ছেলেমানুষি করছি না, সহজে তোমরা বিশ্বাস করবে কেন ?

৫

একসঙ্গে তিনটি রোগী জুটে যায় কেদারের।

তার ডাক্তারি জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম।

তিনজনের একজনও তাকে এক পয়সা ফি দেয়নি, পাবার আশাও নেই। এ দিকটা ধরলে হয় তো এদের ঠিক রোগী বলা যায় না।

পাশের বাড়িতে মায়ার একটি বন্ধু আছে, বীণা। কেরানি স্বামী আর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বীণা বাস করে।

বিজন নিচু স্তরের অল্প মাইনের কেরানি। অতি কষ্টে সংসার চলে।

একটি ঘরে তিনটি জীবের অভাব অনটন ভরা জীবন একটা বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মায়ার কাছে। ওই ঘরে নিদারুণ অভাব আছে কিন্তু দারিদ্র্যের অভিশাপ নেই। ওই অভিশাপকে ব্যর্থ করার একমাত্র যে পথ, সেই পথ বেছে নিয়েছে বিজন আর বীণা দুজনেই।

দুজনে লড়াই করে। তাদের মতো আরও অসংখ্য জীবনে যারা অভাবের অভিশাপ চাপাবার অবস্থা বজায় রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

মায়া এসে একদিন বলে, কেদারদা, বিজনবাবুকে একটু দেখবেন ? খুব জ্বর হয়েছে।

কেদার সবে ঘুম থেকে উঠেছিল। মুখ-হাত ধুয়ে সে চা খাবার খায়, মায়া বন্ধুকে খবব দিয়ে এসে ধন্না দিয়ে বসে থাকে রান্নাঘরের দরজায়।

কেদার ঘরে গিয়ে জামা পরে এলে সে বলে, ফি চাইবেন না কিন্তু। আমার বন্ধুর স্বামী।

তাতে আমার কী ?

ইস্ ! ওরা দাদাকে দেখাতে চেয়েছিল, আমি আপনার কথা বলেছি। ফি দেবাব ক্ষমতা সত্যি ওদের নেই।

কেদার হেসে বলে, ভয় নেই, ভয় নেই। ওদের বদলে তুমি যখন ডেকেছ, ফি কি আমি চাইতে পারি ? সে তো তোমার কাছে চাওয়া হবে ! কিন্তু তোমার দাদাকে ডাকতে চাইল, বারণ করলে কেন ?

মাযা মুখ বাঁকিয়ে বলে, কবরেজিতে নাকি অসুখ সারে ?

পরিমল কবিরাজি আরম্ভ করার পর তাদের দোতলায় আর ডাক্তার ওঠেনি—একমাত্র কেদার ছাড়া। সেও গেছে নিছক কেদার হিসাবেই, ডাক্তার হিসাবে চিকিৎসা করতে নয়। এই সেদিন মায়ার অসুখ হয়েছিল, ওষুধ দিয়েছিল পরিমল।

সেরে উঠলেও মায়া বিশ্বাস করে না দাদার কবিরাজি চিকিৎসায় সে সেরে উঠেছে। দাদার ওষুধ না খেলেও সে এমনিতেই ভালো হয়ে যেত !

কেদারকে মায়া সঙ্গে নিয়ে যায়।

বিজনের খুব জ্বর। পরীক্ষা করে দেখে কেদার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে, মাথায় বরফ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে দবকারি সব ব্যবস্থার কথাও বলে দিয়েছে কিন্তু মনে মনে সে বোধ করেছে প্রচুর অস্বস্তি।

বোগ ধরতে ভুল হয়নি জানে, কিন্তু বিনা অভিজ্ঞতায় একা এমন একটা কঠিন রোগের চিকিৎসা করার দায়িত্ব নিতে গিয়ে দরকার মতো আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছে না। কী ভাবে চিকিৎসা করতে হবে সবই সে জানে—কিন্তু যদি ভুল হয়ে যায়, যদি এমন কিছু কম্প্লিকেশন থেকে থাকে যা সে ধরতে পারেনি এবং যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার ?

এই দ্বিধা সংশয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে কেদার। কঠিন রোগ হলেও প্রথম অবস্থায় এখনই সে বিচলিত হয় কেন নিজের অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য ? দরকার মনে হলে বীণাকে সে বলতে পারবে গয়না বেচে বড়ো ডাক্তার আনার কথা, নয় তো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে বিজনকে।

আজকেই অন্য ডাক্তার আনিয়ে নতুবা হাসপাতালে পাঠিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য মনটা তার ছটফট করছে কেন ?

কঠিন রোগ—জীবন অথবা মৃত্যু। কিন্তু তাই নিয়েই তো কারবার ডাক্তারের ? রোগী মরতে পারে এই ভাবনায় ডাক্তারের কি বিচলিত হলে চলে ?

এতই যদি দুর্বল হয় মন তার, এ পেশা নেওয়া তো তার উচিত হয়নি !

পরিমলকে সে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রথম সিরিয়াস কেসের কথা মনে আছে ?

আছে বইকী। ওই বস্তিতে একেবারে শেষ অবস্থায় ডেকে নিয়ে গেল—ডবল নিমুনিয়া। কয়েকদিন হোমিয়োপ্যাথি চলছিল, তারপর আমায় ডাকে। বাঁচবে ভাবিনি—শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল।

তোমার ভাবনা হয়নি ? ভুলটুল যদি হয়ে যায় ? কনসাল্ট করার কথা ভাবনি ?

কেন ? লক্ষণ সব পরিষ্কার, কী করতে হবে জানি, ভুল হবে কেন ? রোগ না ধরতে পারলে, কী বিধান দেব বুঝতে না পারলে আলাদা কথা ছিল।

একেই কি বলে আত্মবিশ্বাস ? নিজে যতটা জানি যতটা বুঝি তাই দিয়ে যতটা সম্ভব করলাম তার পরে আর কথা নেই ? যদি ভুল হয়ে থাকে—এ প্রশ্ন অর্থহীন ?

কেদার হর্ষের কাছে যায়।

জ্যোতির বিয়ের পর হর্ষ মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ যেন সংসার জীবন আর পেশা সম্পর্কে আরও বেশি নিস্পৃহ হয়ে গেছে মানুষটা। রোগী আর চিকিৎসা সম্পর্কে পর্যন্ত এখন মাঝে মাঝে তার উদাসীনতা দেখা যায়।

হর্ষ তার কথা শুনে হাসে। অনেকদিন পরে কেদার তার মুখে হাসি দেখতে পায়।

ও রকম হবে না ? প্রত্যেক অনেস্ট ইয়ং ডাক্তারের হয়। এটাই তো প্রমাণ যে তুমি সিরিয়াস, রোগীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে তুমি নারাজ। দায়িত্বজ্ঞান থেকে এ রকম নার্ভাসনেস আসে, এটা কেটে যাবে কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানটা চিবকাল থাকবে। বুড়ো হলাম, এখনও একটা রোগী মরলে তন্নতন্ন করে সব হিসাব করি ভুল করেছি কিনা—নইলে স্বস্তি পাই না। তুমি তো ছেলেমানুষ।

হর্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে কেদার। সে ভুলে গিয়েছিল, হর্ষ তার মনে পড়িয়ে দিয়েছে যে বৈজ্ঞানিকও যন্ত্র নয় মানুষ—বিজ্ঞানের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান।

তার দ্বিতীয় রোগীটি পাড়ার একটি ছেলে।

কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, রোগা লম্বা চেহারা কলেজে পড়ে। পাড়ার ছেলে, কাছেই বাড়ি, অনেকদিনের চেনা। মাঝে মাঝে এসে কেদারের সঙ্গে দেশ সমাজ রাজনীতি নিয়ে কথা বলে।

নিজেই একটা প্রশ্ন করে কেদারকে, তার মতামত শুনতে চায়, তারপর তর্ক জুড়ে দেয় বিনীতভাবটা আগাগোড়া বজায় রেখে। কত বিষয়ে যে তার কত মতভেদ দেখা যায় কেদারেব সঙ্গে।

মতভেদের জন্যই কেদার সুধীরকে খুব পছন্দ করে।

সুধীর একদিন মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফেরে। দুর্ঘটনা নয়, কুঘটনা। একটা সভায় গিয়েছিল, পুলিশ লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। গায়ের জামাটি খুলে ফাটা মাথায় জড়িয়ে সে কেদারের কাছে হাজির হয়।

প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে।

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কেদার বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাসপাতালে যাওয়া উচিত ছিল সুধীর।

মিছিমিছি হয়তো অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম। পরীক্ষা আসছে, তাই ভাগলাম।

একটু জ্বর হয়েছিল সুধীরের। ব্যান্ডেজ খুলবার দিনও মনে হল তার একটু ঘুষঘুষে জ্বর আছে। দু-একবার সে কাশে।

কেদারের মনে খটকা লাগে। পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদের পর সে ব্যবস্থা করে বুকের ভেতরের ফটো নেবার এবং স্পেশালিস্ট ডাক্তার সেনকে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করাবার।

দেখা যায় সুধীরকে টি বি ধরেছে।

মাথা ফাটার জন্য অবশ্য নয়। মাথা ফাটবার আগেই শুরু হয়েছিল রোগটা।

বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। স্পেশালিস্টের নির্দেশ মতো চিকিৎসা করছে কেদার।

সে ভাবে, ফাটা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য তার কাছে না এলে সে টেরও পেত না মাঝে মাঝে ছেলেটার ঘুষঘুষে জ্বর হয়, তার ভেতরটা এ দেশের এই অতি সুলভ মারাত্মক রোগে খয়ে যেতে শুরু করেছে। আরও কতকাল হয়তো বিনা বাধায় ভেতরে ভেতরে বেড়ে চলত বোগটা—তার কাছে এসে তর্ক করতে করতে মাঝে মাঝে সে কাশত কিন্তু ডাক্তার হলেও যেহেতু ছেলেটা রোগী হিসাবে আসেনি সেই হেতু ওর কাশিটার বিশেষত্ব খেয়ালও হতনা তার।

একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও গোপন বোগটা তার নির্বিবাদে গোপন আক্রমণটা চালিয়ে যেত !

কেদার গীতাকে বলে, এ যেন ঠিক মায়ের ব্যাপারটা আরেকবার ঘটল। চোখের সামনে রোগের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে মানুষ, একটু খেয়াল করলেই সন্দেহ হয়। পরীক্ষা করে ধরা যায়, অথচ খেয়ালটা আমার হয় না কিছুতেই !

গীতা বলে, কী যে বল তুমি ! এত কেউ খেয়াল করতে পারে ? ডাক্তার বলেই কী তুমি মানুষ নও ? চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে তাহলে ওত পেতে থাকতে হয়, কার শরীরে কী লুকানো রোগ আছে। কেউ কাছে এলে তোমায় শুধু খুঁজতে হবে তার কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা।

কেদার বলে, তা নয়। তুমি ভুল বুঝলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আমার চোখে ধরা পড়ছে না।

তৃতীয়টি রোগিণী। তাদেরই বাড়ির ঠিকা ঝি পদ্ম।

শুভময়ীর মরণের পর ঠিকা ঝি দরকার হয়েছে। বিমলা আর অমলা সামলে উঠতে পারে না। অমলার দু-একখানির বেশি বাসন মাজা, মশলা বাটা বা দু-দশ মিনিটের বেশি উনানের আঁচে থেকে রান্না করা নিষেধ।

হাত-পায়ের আঙুল মোটা হয়ে গেলে, গায়ের রং ময়লা হলে তাকে পার করা নিয়ে মুশকিল হবে।

শুভময়ী বেঁচে থাকতে তাকে দেখতে এসেছিল একটি ছেলের পক্ষের মেয়েরা। হাতেব পায়েব আঙুল পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে গেছে।

অমলা কেদারের জীবনে একটা বড়ো আপশোশ।

তার ডাক্তারি পড়ার জন্য অমলার পড়া বন্ধ হয়েছিল। চুপ করে মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকেনি।

এখন আবার সমস্যা দাঁড়িয়েছে যে সে বিয়ে করে টাকা না আনলে ওকে পার করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি পসার করে টাকা আনলেও অবশ্য চলে। কিন্তু সে ভরসা কেউ রাখে না।

বিমলার পিছুপিছু পদ্ম এসে ঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

বিমলা বলে, ঝি বলছিল ওকে একটু ওষুধ দিতে।

কী হয়েছে ?

মুখে ঘা হয়েছে, খেতে পারে না। গলা বসে গেছে, কানে ব্যথা—

পদ্মর দেহটা শুকনো, বয়স খুব বেশি নয়। তিন বছরের একটি ছেলে আছে। স্বামীর নাম বংশীধর।

তাকে পরীক্ষা করে কেদার বলে, আজ ওষুধ দেওয়া যাবে না। তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দিয়ো। আর ও বেলা থেকে তুমি কাজে এসো না।

হায় রে কপাল পদ্মর ! ডাক্তারের বাড়ি কাজ করছে ভেবে বিনামূল্যে একটু ওষুধ চাইতে গিয়ে তার চাকরিটা গেল !

পদ্ম নড়ে না।

কেদার বুঝিয়ে বলে, তোমার অসুখের ভালো চিকিৎসা দরকার। তোমার স্বামীকে সব বুঝিয়ে বলা দরকার। চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

তবু পদ্ম নড়ে না।

বিমলাকে মৃদুস্বরে সে তার বক্তব্য জানায়। বিমলা কেদারকে জানায়, ওব স্বামী মাঝে মাঝে আসে, চলে যায়।

অর্থাৎ এখন কিছুদিন বংশীধরের পাত্তা মিলবে না। তাকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মকে চিকিৎসার জন্য আসতে বলা বৃথা। তিন বাড়ি খেটে সে কোনোমতে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে নিজের ধড়ে প্রাণটা বজায় রেখেছে—

সুতরাং পদ্মকে সঙ্গে নিয়ে কেদারকেই হাসপাতালে পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে যেতে হয়।

পদ্মকে সে সাবধান করে দেয় যথানিয়মে, স্বামী ফিরলেই আগে যেন তারও চিকিৎসা হয়, নইলে আবার তার এই কুৎসিত রোগটা হবে। কিন্তু পদ্ম বিশেষ গা করেছে মনে হয় না।

রোগটা সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য ব্যস্ত হবার উপায় তার নেই। তাড়াতাড়ি রোগের লক্ষণগুলি চাপা পড়লেই সে বাঁচে—তাকে খেটে খেয়ে বাঁচতে হবে।

নিচুর তলার গরিব অসহায় রোগী এই তার প্রথম। কিন্তু তার তো আর অজানা নয় গরিব অসহায় এই মানুষগুলি কত রকমের কত রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় সেরে ওঠে, পঙ্গু হয়, মরে যায় !

এটা তার হৃদয়ের একটা স্থায়ী বেদনা।

তার সাধ্য নেই ওদের জন্য কিছু করে। ডাক্তার হয়েছে বলে একা ওদের যতজনের পারে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জীবনটা ধন্য করার ফাঁকিতে সে বিশ্বাস করে না। অনেক ধনী ব্যক্তি দাতব্য ঔষধালয় খুলে দিয়েও কী এ অভিশাপের এতটুকু গুরুত্ব কমাতে পেরেছে ? ভিক্ষা দিয়ে কী একটা দেশের দারিদ্র্য ঘোচানো যায় ?

তবু কিছু তার করতে ইচ্ছা হয়। যে ভাবে সত্যিকারের প্রতিকার হবে, রোগ হলে মানুষ আকাশের রোদ বৃষ্টির জল আর গাছের ছায়ার মতো ওষুধ পথ্য চিকিৎসা পাবে।

কিন্তু সে জানে না কী ভাবে সে এটা সম্ভব করার কাজে অংশ নিতে পারে, তার ডাক্তারি পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে।

**এখনও ঠিকমতো আরম্ভ করেনি ডাক্তারি জীবন, অথচ নানা কাজে নানা ঝঞ্ঝাটে কোথা দিয়ে সময় চলে যায় সে যেন টেরও পায় না।**

জ্যোতি বলে, এই বুঝি লাভ হল তোমার বন্ধুর বউ হয়ে ? একবার খবরও নাও না বেঁচে আছি কী মরে গেছি !

জ্যোতিকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ছেলেবেলা থেকে কতবার এসেছে গিয়েছে কিন্তু এবার বউ সেজে স্থায়ীভাবে এ বাড়ির দোতলায় এসে উঠেই সে যেন খুশিতে আনন্দে স্বাস্থ্যের বিকাশে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছে।

সেই সঙ্গে এমন ভাবে নিজেকে সে মানিয়ে নিয়েছে এ বাড়ির পাঁচজনের সংসার ও সংস্কারের সঙ্গে যে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে সে বুঝি পেয়ে এসেছে এ বাড়িতে সকলের মনের মতো বউ হবার শিক্ষা ! সে যেন মানুষ হয়নি হর্ষ ডাক্তারের বাড়ির একেবারে আলাদা পরিবেশে।

একমাত্র পরিমল ছাড়া গোড়ায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল সকলের মুখ। হর্ষ ডাক্তারের এই মেয়েটাকে ঘরে আনবে পবিমল, এমন আচমকা আনবে, বাড়ির কারও অনুমতি বা পরামর্শের তোয়াক্কা পর্যন্ত না রেখে—এক পয়সা পণ না নিয়ে !

পরিমলকে বউ নিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যেতে বলাব কথা পর্যন্ত ভেবেছে জনার্দন।

জ্যোতি প্রায় সকলের মুখ থেকেই অসন্তোষের সেই অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। নতুন বউয়ের কাছে সবাই যেমন আশা করে ঠিক তেমনই করেছে সে তার ওঠাবসা কথাবার্তা চালচলন। শাশুড়িকে জানিয়ে রেখেছে খুব সঙ্গত এক সূত্রে যে তার মায়ের গয়নাগাঁটি সব সে পাবে। তার ছোটো ভাইটি খুবই ছোটো। বড়ো ভাইয়ের বউ বিধবা।

কয়েক বছর পরে মা তার শুরু করবে তীর্থে তীর্থে ঘুরে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া—তার আগে গয়নাগুলি তাকে দিয়ে যাবে।

বাড়ির সকলের কানে পৌঁছে দেবার জন্য মায়াকে সে চুপিচুপি জানিয়ে রেখেছে যে জামাই যদিও মোটেই পছন্দ হয়নি তার বাবার, তবু বাবার তার পরিকল্পনা আছে পরিমলের পসার বাড়িয়ে খ্যাত বাড়িয়ে তাকে উঁচুতে তুলে দেবার !

জনার্দন শুনে জ্যোতিকে ডাকিয়ে সস্নেহে বলেছে, বউমা, তোমার বাবা তো এত বড়ো ডাক্তার। তা তিনিও চিকিৎসা করেন, পরিমলও চিকিৎসা করে। ওর জন্য কিছু করতে পারেন না বেয়াই মশাই ?

নতমুখে মৃদুস্বরে জ্যোতি বলেছে, করবেন বইকী বাবা। কী ভাবে করবেন তাই ভাবছেন। তবে কিনা খুব তো খুশি হতে পারেননি, তাই দুদিন একটু—

সে তো বটেই ! সে তো বটেই !

জ্যোতির অনুযোগের জবাবে কেদাব বলে, তুই এখন পরের ঘরের বউ। অত খবর নিলে চলবে কেন ?

গীতাদিকে কবে আনবে বউ করে ?

কে জানে কবে। সে তো তোর মতো পাগল নয় বউ হওয়ার জন্য।

বিজনের বোগটা একদিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাঁকা পথ ধরে। কেদারের এ আশঙ্কা ছিল কিন্তু এমন বিপর্যয় সে কল্পনা করেনি।

নিজেকে সে ধিক্কার দেয়।

এখনও সে জীবনের মমতায় ভরপুর। তাই ডাক্তার হয়েও একটা রোগীর রোগ হঠাৎ বিগড়ে যাওয়াতে নিজেকে সে নিন্দা করতে পারে মনে মনে।

হর্ষের কাছে ছুটে যায়।

রাত এগারোটার সময় হর্ষের তখন ঢুলুঢুলু চোখ। সে বলে, রাত দশটার পর আমি তো রোগী দেখি না।

জ্যোতির বিয়েতে যে অবিশ্বাস্য কার্পণ্য করেছে হর্ষ ডাক্তার, তার মানেটা কেদার বুঝতে পারে। নাম-করা ডাক্তার, দিনদিন পসার তার বেড়েই যেত স্বাভাবিক নিয়মে—যদি শুধু দয়া করে সে দরকারের সময় টাকা নিয়ে একবার হাজির হত রোগীর বিছানার পাশে। জ্যোতির বিয়ের পর মদ তার কাছে আরও তুচ্ছ করে দিয়েছে রোগীর জীবন, একগুণ পরিশ্রমের দশগুণ দাম নিয়েও সে ডাক্তারের উপস্থিতি আর চিকিৎসা পেয়ে রোগীকে মরতে দেবার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরোতে রাজি নয় রাত দশটার পর।

ট্যাক্সি নিয়ে কেদার ছুটে যায় ডাক্তার পালের বাড়ি। বাড়িটা অনেক দূর। কিন্তু কী করবে, কাছাকাছি বড়ো ডাক্তার যারা আছে, তাদের তো সে চেনে না। নতুন ডাক্তার হয়ে পরের জন্য বিনা পয়সায় সে অনেক সময় আর পরিশ্রম খরচ করেছে, এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার চেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ একজন বৈজ্ঞানিককে তার দরকার হয়েছে এ কথা জানলেই তারা তো আর ছুটে আসবে না তার ডাকে !

ডাক্তার পাল বই পড়ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম বই।

বিরক্ত হয়ে বলে, গীতা ঘুমিয়ে পড়েছে কেদার !

আমি আপনার কাছেই এসেছি।

এতরাত্রে হঠাৎ ? ডাক্তার হতে চলেছ কেদার, বাজে কথায় সময় নষ্ট কোরো না। সংক্ষেপে স্পষ্ট করে বলো।

কেদারের বিবরণ শুনে ডাক্তার পাল বলে, তুমি ঠিক ধরেছ। এ রকম অবস্থায় ব্রেনটা বাঁচানোই আসল কথা। এ তো খুব সোজা কথা কেদার। ব্রেনটা বাঁচালেই রোগী বেঁচে যায়।

আপনি একবার চলুন।

ডাক্তার পাল নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরায়। প্রশ্ন করে, তোমার কে হয় বললে ?

আমার কেউ নয়।

ডাক্তার পাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি কোনোদিন ডাক্তার হতে পারবে না কেদার। তোমার নিজের কেউ নয়, চেনা একটা লোক মরছে দেখেই তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ ! একবার ভাবলে না যে এত বড়ো শহরে এ রকম কত লোক মরছে ? আমার সাধ্য আছে তাদের সকলকে গিয়ে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে দিই ? আমাকে তাহলে ডাক্তার না হয়ে ধোপার গাধা হতে হত অনেক আগে।

কেদারের মাথা ঘুরছিল। ঝোঁকের মাথায় সে বলে বসে, আপনার পুরো ফি দেবে।

এ কথাটা গোড়াতে বললেই পারতে ?

পোশাক ডাক্তার পালের এক রকম পরাই ছিল, শুধু জুতোটা পায়ে লাগিয়ে আলমারি খুলে দুটো ওষুধ ব্যাগে ভরে দু-মিনিটে তৈরি হয়ে যায়।

রতন ! বলে ডাক দেওয়ামাত্র তার ড্রাইভার রেশনের গম ভাঙানো রুটির টুকরো চিবোতে চিবোতে গেঞ্জি গায়ে এসে স্টিয়ারিং হুইল ধরেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেয়।

একেবারে যেন মিলিটারি তৎপরতা !

বিজনকে পরীক্ষা করে ব্যাগ খুলে ডাক্তার পাল তাকে একটা ইনজেকশন দেয়। বলে, তুমি স্টুডেন্ট ভালো ছিলে। এ কী রকম ডাক্তারি শুরু করলে কেদার ?

কেদার বিরস মুখে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার পাল বলে, আমায় ডাকতে না গিয়ে ইনজেকশনটা দু-ঘণ্টা আগে দিলেই পারতে ?

বলে, তোমরা সাহস পাও না। কেন পাও না ? ডাক্তার কি ইয়ার্কি দেয় রোগীর সঙ্গে ? সে যে বিজ্ঞান শিখেছে সেইমতো চিকিৎসা করে যায়, রোগী বাঁচবে কী মরবে সে দায় তো তার নয় !

আরেকটা ইনজেকশন দেয় বিজনকে। খানিক পরেই উঠে দাঁড়ায়।

কেদারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে মাথা নাড়ে।

ডাক্তারি জীবনে এই প্রথম রোগীর মরণ ঘটল কেদারের।

কেদার ভাবে, তাতে কী হয়েছে ? আমার কি দোকানির মন রয়ে গেছে ? বউনিটা ভালো হল না বলে মন খুঁতখুঁত করবে ?

দুঃখ হলেও মায়ার কাছে তাকে ডাক্তার পালের ফি-এর দাবিটা তুলতে হয়।

মায়া বলে, এ সময় কোন মুখে গিয়ে চাইব ? কত লাগবে ?

ডাক্তার পালের ফি-র অঙ্ক শুনে মুখ শুকিয়ে যায় মায়ার। সে বলে, কী সর্বনাশ, ওঁকে আপনি ডাকতে গেলেন কেন ? এ টাকা কোত্থেকে দেবে ?

কেদার ভাবে, বাঃ, বেশ ডাক্তাব আমি। আমার রোগীও মরল, চিকিৎসার টাকাটাও দিতে হবে আমারই পকেট থেকে।

৬

অঞ্জলি একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। উপলক্ষ, তার নিজেব জন্মদিন।

কেদার সেদিন তাকে চিনতে পারেনি বলে সে নাকি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। না চেনাই তো স্বাভাবিক। আট-নবছর আগে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসত, তাও আবার অমলার কাছে। বোনেব বন্ধু বলে কেদার ভাসা ভাসা ভাবে হয়তো বা কোনোদিন দু-একটা কথা বলেছে, কোনোদিন তাও বলেনি।

তার পক্ষে কি মনে রাখা সম্ভব অঞ্জলিকে ?

তবে আমি জানতাম, পরে আপনার মনে পড়বে।

কী করে ?

অঞ্জলি মুচকে হাসে।

প্রথমে আমিও আপনাকে চিনতে পাবিনি। গীতার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, একজন ক্লাসফ্রেন্ড বললে, ওই দ্যাখ আমাদের গীতার ইয়ে। ইয়ে মানে বোঝেন তো ? ভালো অর্থে ইয়ে—মানে, যার সঙ্গে যথারীতি এনগেজমেন্ট হয়েছে। তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। বাড়ি ফিরে হঠাৎ মনে পড়ল—ইনি তো সেই অমলার সেই দাদা ! যিনি হঠাৎ একদিন পাঁচ মিনিটে আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।

কেদার হেসে বলে, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ? কী বিশ্রী ব্যবহারটা করেছিলাম আপনাকে ছেলেমানুষ পেয়ে !

আমার কিন্তু দুঃখ বেশি হয়নি, গাও বিশেষ জ্বালা করেনি। শুধু ভড়কে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এতটুকু মেয়ে বাঁদর নাচানোর কায়দা জানল কী করে ?

এতটুকু মেয়ে কী কেদাবদা ? পনেরোয় পা দিয়েছিলাম। আপনার বোধ হয় কুড়ি একুশ হয়েছিল ? আপনার তুলনায় কত পেকে গিয়েছিলাম ভাবুন তো !

কেদার শুধু একটু হাসে।

অঞ্জলি বলে, আচ্ছা কেদারদা, ব্যাপারটা কী বলুন তো ? এমন স্মার্ট ছিলেন, কলেজে পড়তেন, আমার বেলায় অমন হাবাগোবার মতো হয়ে গেলেন কী করে ?

হাবাগোবাই ছিলাম। তাছাড়া কী জানো, আমি তো ঠিক প্রেমে পড়তে চাইনি তোমার, মুক্তি চেয়েছিলাম।

বুঝলাম না তো।

বুঝলে না ? ছেলেমেয়েদের এই যে প্রেমে পড়ার বাতিক, হালকা রোমান্স খোঁজার রোগ, এটা শুধু বাজে বই পড়ে বাজে সিনেমা দেখে জন্মায় না। বই সিনেমা এ সবের মারফতে কাঁচা মনে বিকারের চাষ তো চলছেই—সস্তা রোমান্সে মুড়ে বিষ ছড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমার মতো ছেলেরা যে প্রেমকাতর হয়, তার আরেকটা দিক আছে।

কেদার আর হাল্‌কা সুরে কথা কয় না। অঞ্জলির মুখের দুষ্টামি-ভরা হাসিটুকু মুছে যায়।

আমার কথাই ধরো। আধা-গেঁয়ো আধা-শহুরে গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। সংকীর্ণ একঘেয়ে জীবন, কত কিছু চাই কিন্তু পাই না, পরিবেশটার চাপে দম আটকে আসে।

টের পেতেন ? বুঝতেন সবই?

সে চেতনা থাকলে আর ভাবনা কী ছিল বলো ? এখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা কী হয়েছিল। ওই অবস্থায় দিন কাটাই, কত স্বপ্ন দেখি—কিন্তু অন্ধকার ভবিষ্যৎ কেবল হতাশা পাঠায়। এদিকে বইয়ে পড়ি সিনেমায় দেখি মুক্ত স্বাধীন অ্যারিস্টোক্র্যাটদের জীবন—কোনো বাস্তব সমস্যা নেই, শুধু ভাব নিয়ে মশগুল। প্রেম ছাড়া কোনো ব্যাপারে কারও মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। শুধু প্রেম নিয়ে পাক খাওয়া।

সত্যি !

তখন তুমি উদয় হলে। মনে হল, এই মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করে আমিও তো মুক্তি পেতে পারি সমস্ত বিশ্রী ঝঞ্ঝাট থেকে ? মনে হল মানে অনুভব করলাম।

অঞ্চলি ঘাড়ে ঝুলানো খোঁপাটা একটু ঠেলে দিয়ে বলে, বড়ো ভুল করেছি কেদারদা। আপনার সঙ্গে মেলামেশা বজায় রাখা উচিত ছিল। জানেন, খানিক আগেও আপনাকে সেই হাবাগোবা ভালো ছেলে আর গীতার ইয়ে মনে করে রেখেছিলাম।

ধারণাটা হঠাৎ বদলাল কীসে ?

আপনার কথা শুনে।

আমি তো এমন কিছু দামি কথা বলিনি।

অঞ্জলি তার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলায়। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরনে, পায়ে একটা স্যান্ডেল। চুল বড়ো হয়েছে, দু-হপ্তা আগেই চুল ছাঁটা উচিত ছিল। গলায় আঙুল দিয়ে ঘষলে নিশ্চয় ময়লা উঠবে। তার দিকেই চেয়ে আছে কিন্তু যেন পুরুত ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে, ধীর শান্ত দৃষ্টি, তার দেহের গড়নে চোখ বুলাবার অথবা তার মুখের সৌন্দর্য বিচার করার কিছুমাত্র আকুতি নেই।

কথা বলতে গিয়েও অঞ্জলি আরেকবার থেমে যায়।

মনে হয়, ভুল করেনি তো ?

সে যে একদিন একে বাঁদর নাচিয়েছিল, আজ এটা তারই প্রতিশোধ নেবার কায়দা নয় তো ? সমস্তটাই অভিনয় নয় তো কেদারের ?

কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে ডিগবাজি খাইয়ে দেয় অঞ্জলি। অভিনয় ! অভিনয় ! চারিদিকে সে কেবল খুঁজে বেড়ায় অভিনয়—মনকে আড়ালে রেখে বাইরে মনের মিথ্যা পরিচয় ঘোষণার অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া এ জগতে কোনো মানুষের যেন আর কোনো কাজ নেই।

শুনে রাগ করবেন কেদারদা ?

রাগ করতেও পারি।

কেদার হাসে। তার ঝকঝকে দাঁত দেখে অঞ্জলির খেয়াল হয়, মাড়ির একটা দাঁত আজ তার একেবারেই টনটন করছে না।

না। রাগ আপনি করবেন না। আমারই প্রাণ খুলে কথা কইতে বাধোবাধো ঠেকছে। সত্যি কথা শুনবেন ? আমি আজ খালি জন্মদিনের নেমন্তন্ন করতে আসিনি।

ওই অজুহাত নিয়ে এসেছ।

ঠিক। এই অজুহাতে এসেছি।

অঞ্জলি তার সুন্দর শোভন দামি হাতব্যাগটি খুলে ছোটো একটি সুপারির কুচি মুখে ফেলে দেয়।

বলে, সেদিন কলেজের গেটে গীতার জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভেবেছিলাম এ মানুষটাকে গীতা কেন বেছে নিল—ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা স্কলার মানুষটাকে ? বাড়ি গিয়ে অমলার ফটোটা দেখে যখন মনে পড়ল আপনি কে—আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার সেই ছেলেবেলার লাভারকে গীতা শেষে পছন্দ করল !

ভাবলে না, সেই আমি যাকে বোকা পেয়ে নাজেহাল করেছিলাম ?

ভেবেছি। ব্যাপারটা বুঝবার জন্য প্রাণটা ছটফট করছিল। বিশেষ ভাব না থাক, আমি তো জানি গীতাকে। ওর খুঁতখুঁতানির অন্ত নেই। রাজপুত্রের মতো কত ছেলে পাত্তা পেল না। আপনাকেও তো জানতাম, পাঁচ-সাতবছরে কী এমন আপনি হয়ে গেলেন যে আপনাকেই গীতা পছন্দ করে বসল ? এটা না বুঝতে পেরে আমার যেন সব কিছুতে অরুচি জন্মে গেল সেদিন থেকে।

এখন বুঝতে পেরেছ নাকি ?

পেরেছি। আপনার মধ্যে অনেক কিছু সম্ভাবনা আছে। সেই সঙ্গে যেরকম আত্মবিশ্বাস দেখছি আপনার, আপনি একদিন অনেক বড়ো হবেন।

কেদার আশ্চর্য হয়ে যায়। গীতার কথা মনে পড়ে। গীতাও তাকে পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছে যে সে লড়াই করে বড়ো হবে, বড়ো হবার সুযোগ সুবিধা তার নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে হবে, এটা গীতার ভালো লাগে। এটাই গীতার চোখে তাকে বড়ো হবার সহজ পথ যাদের সামনে খোলা আছে তাদের চেয়ে মানুষ হিসাবে বড়ো করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ আলাপ করেই অঞ্জলিও টের পেয়ে গেছে নিজের চেষ্টায় একদিন সে বড়ো হবে।

সেই সঙ্গে অঞ্জলি আবিষ্কার করেছে তার আত্মবিশ্বাস !

অঞ্জলি বলে, আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা উচিত ছিল। মেলামেশা করলে আমারই উপকার হত।

কী রকম ?

আপনার সঙ্গে আলাপ করলে উদ্‌বেগ কেটে যায়, মনটা শান্ত হয়। শান্ত হয় মানে, অস্থিরতা কেটে গিয়ে একটা ধীর ভাব আসে। এখানে আসবার আগে কেমন একটা ছটফটানির ভাব ছিল— আগে অবশ্য বুঝতে পারিনি। ও ভাবটা সর্বদাই থাকে। আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে সেটা ঝিমিয়ে এসেছে। এখন বুঝতে পারছি।

কেদার হেসে বলে, তুমি আমার তোষামোদ জুড়েছ। আরেকবার জব্দ করার মতলব নেই তো ?

অঞ্জলিও হেসে বলে, মতলব থাকলেই বা পারব কেন ? অত বোকা আমি নই, এটুকু বুঝতে পারি। আসল কথাটা কী জানেন কেদারদা ? আপনি সাদাসিদে সাধারণ ছেলে, বাইরে কোনো আবরণ নেই, মানুষকে চমকে দেবার মতো আশ্চর্য কোনো প্রতিভার লক্ষণও প্রকাশ পায় না—এটার মানে আগে ধরতে পারিনি। আপনার বাইরেটাও শান্ত, ভেতরটাও শান্ত—এ জন্য আপনাকে ভেবেছিলাম ভোঁতা। আসলে আজকের দিনে আপনার মতো অবস্থার একজনের পক্ষে বড়ো হবার লড়াই করতে নেমে ভেতরে এ রকম স্বাভাবিক শান্তভাব বজায় রাখা যে কত বড়ো প্রতিভার লক্ষণ, আজ সেটা টের পেয়েছি। আপনার প্রকৃতিটাই এ রকম আশ্চর্য ধরনের, অকারণে আপনি অস্থির হন না। আমরা সব সময়েই এটা নিয়ে ওটা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে থাকি, ধৈর্য বলে কিছু নেই।

কেদারের মনে পড়ে, কথা অঞ্জলি আগেও অনর্গল বলে যেত। এদিক দিয়ে অমলার সঙ্গে তার খুব বনত—অমলা চুপচাপ মন দিয়ে তার কথা শুনত।

কেদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এতই অন্যমনস্ক হয়ে যায় অঞ্জলি যে অমলাকে তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতেই শুধু ভুলে যায় না—অমলার সঙ্গে দেখা না করেই সে চলে যায়।

এই ভুল সংশোধনের জন্যই অবশ্য বিকালে আরেকবার তাকে আসতে হয়।

কেদার তখন বাড়ি ছিল না।

অমলা বলে, মাগো মা, কী জমকালো চেহারা করেছিস ! কত বড়ো হয়ে গেছিস।

মুটিয়ে গেছি, না ?

মোটা নয়। বেশ জমজমাট চেহারা হয়েছে।

তুই তো তেমন বাড়িসনি ?

সেটা আমার বাপদাদার ভাগ্যি !

বিমলা শুনতে পেয়ে বলে, তোর যে কেমন ধারা কথা অমলা। বাপদাদা কি তোকে বোঝা ভাবে ?

অমলা চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বুঝতে পারে বাবা এবং দাদা অর্থাৎ কেদার তাকে বোঝা মনে কবে না এটা মানতে সে রাজি নয়।

অমলার পড়া কেন বন্ধ করা হয়েছিল অঞ্জলি জানে। আজ এতদিন পরে পুরোনো কালেব বান্ধবীর কাছাকাছি এসে সে টের পায়, শুধু পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই অমলা কোথায় ঠেকে রয়ে গেছে, কতখানি ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের মধ্যে।

পার্থক্য তাদের মধ্যে আগেও ছিল। তারা যে দুটি পরিবারে জন্মেছে তার মধ্যেই অনেক তফাৎ, আচার ব্যবহার খাওয়া পরা রুচি অরুচি সব দিক দিয়ে সেটা আজও বজায় আছে। কিন্তু অন্যদিক দিয়েও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে। অমলা যেন আর বড়ো হয়নি মনের দিক দিয়ে।

শুধু পড়াশোনা করার জন্যই মনের বয়সটা তার বেড়েছে কিন্তু অমলাব মনটা আজও তেমনই কাঁচা থেকে গেছে—সেই কাঁচা অবস্থাতেই সংসারের চাপে এবং তাপে খানিকটা নীবস পক্কতা এসেছে, এই মাত্র।

স্কুল কলেজে পড়াবার খরচ না কুলোক, নিজে পড়াবার সময় না থাক, কেদাব কেন বোনকে নিয়মিত সাধারণ বই পড়তে শেখায়নি, বাইবের জগতের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় করিয়ে দেয়নি ?

ঘরের কোণে আটকে রেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে ?

জ্যোতির সঙ্গেও আলাপ হয় অঞ্জলির।

আগে যখন এ বাড়িতে অঞ্জলির আসা যাওয়া বজায় ছিল তখন দু-একবার জ্যোতিকে সে দেখেছে। কিন্তু সে কথা আজ মনে পড়ে না।

তাই একেবারে নতুন করেই আলাপ পরিচয় হয়।

শাশুড়ির সঙ্গে জ্যোতি গঙ্গাস্নান করে ফিরছিল।

অমলা বলে, এই অবেলায় চুল ভিজিয়ে চান করেছিস ?

জ্যোতি মৃদু হেসে বলে, চুল না ভিজিয়ে কি গঙ্গাস্নান হয় ?

বিকালে গঙ্গাস্নান কেন ?

চারটের পর যোগ শুরু হয়েছে।

অমলা হেসে বলে, তুই সত্যি দেখালি বটে জ্যোতি ! আজও বোধ হয় পেটে তোর মুরগির মাংস গিজগিজ করছে।

জ্যোতি বলে, বলিস নে ভাই। ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে !

অঞ্জলির দিকে চেয়ে বলে, এ সব শুনলে আপনাদের হাসি পায় কিন্তু যার যেমন রুচি, কী বলেন ?

অঞ্জলি বলে, তা বইকী।

অমলা বলে, তোর তো ধার করা রুচি। বিয়ের সঙ্গে গজিয়েছে।

জ্যোতি বলে, তোদের রুচিও তো সায়েবদের কাছে ধার করা ? বাছবিচার না করে মানুষ যা-তা খাবে, যা খুশি করবে, ও সব এ দেশে ছিল ? আমি বরং দেশি রুচি ধার করেছি।

মনে হয়, পরিমল যেন কথা কইছে জ্যোতির মুখ দিয়ে !

বসতে বলা হলেও জ্যোতি বসে না, ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। সে ওপরে চলে গেলে অমলা তার কাহিনি অঞ্জলিকে শোনায়—যতটা তার জানা ছিল।

অঞ্জলি বলে, আশ্চর্য মেয়ে তো !

কেদারের কাছে সমস্ত কাহিনিটা শুনলে সে কী বলত কে জানে।

অমলাকে জন্মদিনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে বলে, যাস কিন্তু কেদারদার সঙ্গে।

সংসারের অনেক কাজ—

সংসারের অনেক কাজ বলে একদিন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন পর্যন্ত রাখতে যাবি না ?

অগত্যা অমলা বলে, আচ্ছা যাব।

কেদার কিন্তু একাই যায়।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করে, অমলা এলো না ?

কেদার একটু চুপ করে থেকে বলে, না, এলো না। আমিও জোর করলাম না।

কেন ?

সে তো বুঝতেই পারছ। এ রকম নেমন্তন্ন রাখার অভ্যাস ওর নেই। এসে শুধু লজ্জা পাবে। কারও সঙ্গে মিলতে মিশতে পারবে না, জড়পিণ্ডের মতো বসে থাকবে।

আগে কিন্তু আসত। অস্বস্তি বোধ করত না।

তখন কত ছোটো ছিল। আজ নিজেকে বুড়োধাড়ি মেয়ে ভাবছে তো। মনের গড়নটাই অন্যরকম হয়ে গেছে।

কেন তা হতে দিলেন ?

কেদার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বলে, পড়া নয় ছেড়ে দিল—বাইরে যাওয়া আসা বন্ধ করলেন কেন ?

আমি কিছুই বন্ধ করিনি। পাড়ায় কাছাকাছি বাড়িতে একলাই যায়। দূরে হলে কাউকে সঙ্গে নেবার দরকার হয়। তবে যেসব বাড়িতে যায় সেগুলি আমাদের বাড়ির মতোই।

সেদিন জ্যোতির সম্পর্কে অমলার মন্তব্য স্মরণ করে অঞ্জলি ভাবে, নিজেও সে যে কী ছিল আর আজ কী হয়েছে অমলার বোধ হয় খেয়াল হয় না। হলে জ্যোতির বাড়াবাড়ি নিয়ে হাসাহাসি করার সাধ্য তার হত না নিশ্চয়।

অঞ্জলির দাদা ডক্টর অনাদি সেন বিজ্ঞানে নাম করা অধ্যাপক।

কেদার নামটাই শুনেছিল, আজ পরিচয় ঘটে। অতি সুন্দর চেহারা, চোখ দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি।

অঞ্জলির বাবার সঙ্গেও পরিচয় হয়।

অঞ্জলির বাবা কে টি সেনও নাম-করা লোক। পেশা ব্যারিস্টারি। এককালে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ ছিল, এখন সে সব বালাই নেই।

কে টি অর্থাৎ কান্তিতীর্থের চুলে পাক ধরেছে ভালোভাবেই। তার পরনে ঘরোয়া বিলাতি পোশাক। কিন্তু অনাদির খাঁটি স্বদেশি বেশ, সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি।

দেখলেই বুঝতে পারা যায় বাপ-বেটা দুজনে তারা বাড়িতে এই দুরকম বেশেই রীতিমতো অভ্যস্ত।

তবে এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অনাদির বেশটা অভ্যস্ত হলেও একটু লোক-দেখানো ব্যাপার।

সত্যই সে মেধাবী ছাত্র ছিল বিজ্ঞানের। অধ্যাপক হয়েও অল্পদিনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নাম করেছে। বেশ সম্পর্কে তার এই দুর্বলতাটুকু কেদারকে সত্যই আশ্চর্য কবে দেয়।

পরিচয় হওয়ায় সে যে বিশেষভাবে খুশি হয়েছে এটা গোপন করার চেষ্টামাত্র না করে কেদার বলে, আপনার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করছে দেশ।

আমি তো চললাম।

কেদার ভাবে, অনাদি আবার বিদেশে যাচ্ছে আরও বেশি জ্ঞানের জন্য। সে রীতিমতো ঈর্ষা বোধ করে।

কোথায় যাবেন ?

অঞ্জলি বুঝিয়ে বলে, দাদা ভালো গবর্নমেন্ট সার্ভিস পেয়ে গেছেন। বউদির বাবা চেষ্টা করে জুটিয়ে দিয়েছেন। বউদির বাবার নাম শুনেছেন তো ? বসন্তবাবু।

শুনে কেদার যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আপনি সরকারি চাকরি নিলেন ? আপনার সায়ান্টিস্টের কেরিয়ার তো নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে ?

অনাদি উদাসভাবে বলে, একেবারে নষ্ট হবে না। খানিকটা অসুবিধা হবে। কিন্তু উপায় কী, এ রকম একটা চাকরিও তো ছাড়া যায় না।

আপনি ইচ্ছা করলে সারা পৃথিবীতে নামকরা বৈজ্ঞানিক হতে পাবেন !

কান্তিতীর্থ হেসে বলে, ইংরেজ রাজত্বে স্টার্ভ করে নাম কিনে লাভ কী বলো ? নেটিভ জিনিয়াসের কোনো দাম ইংরেজ দেয় না। ভালোমতো একটা ল্যাবরেটরি কী পাবে এক্স্‌পেরিমেন্ট করাব জন্য ?

তবু—

কান্তিতীর্থ সশব্দে হেসে ওঠে।—ইয়ংম্যান, যতদিন এই সেন্টিমেন্ট না ছাড়তে পারবে ততদিন এ দেশের মুক্তি নেই। স্বাধীনতা হচ্ছে রিয়ালিটি—রিয়ালিটিকে মূল্য দিতে না শিখলে স্বাধীন হওয়া যায় না।

অঞ্জলির অনুরোধে কেদার অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের অনেক আগে এসেছিল। সরলভাবেই অঞ্জলি জানিয়েছিল যে তার বাবা ও দাদার সঙ্গে সে একটু বিশেষভাবে কেদারকে পরিচিত করিয়ে দিতে চায়। তার এই ইচ্ছার কারণটা অবশ্য সে খুলে বলেনি। এতক্ষণে অন্যেরা একে দুয়ে আসতে আরম্ভ করলে তার সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ অনাদি বা কান্তিতীর্থের থাকে না। অঞ্জলিরও নয়।

তবে অঞ্জলি তাকে ভরসা দিয়ে রাখে, কাল আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব।

রাত প্রায় আটটার সময় নিমন্ত্রিত সকলের মন ও মান রক্ষা করতে করতে হঠাৎ একফাঁকে বলে, গীতাকে বলেছিলাম, কই, সে তো এল না ?

কেদার বলে, গীতার মন খুব খারাপ। দিল্লি থেকে ফিরে কোথাও যায় না। ওর বন্ধুর খবর শুনেছ তো ?

শুনেছি।

অঞ্জলি আরেকজনের কাছে যায়। কী কথা বলে হাসে। সেদিন শিক্ষায়তনের সামনে এবং দুদিন আগে বাড়িতে যখন অঞ্জলিকে দেখেছিল, তার সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছিল কেদারের। আজ নীরব দর্শক হয়ে তাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেয়ে তার রূপ দেখে কেদার সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমন অসাধারণ রূপের ঐশ্বর্য যে অঞ্জলির আছে এটা যেন আজ সে প্রথম আবিষ্কার করে। দুচোখ ভরে দেখেও যেন এই অপরূপ ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না।

রূপসি বলে অহংকার ছিল কিশোরী অঞ্জলির। কিন্তু এবার কদিন মেলামেশা করে নিজের রূপ সম্পর্কে তাকে বিশেষ সচেতন মনে হয়নি।

রূপের অহংকার কী সে কাটিয়ে উঠেছে ?

পরদিন সকালেই অঞ্জলি কেদারদের বাড়ি আসে।

বলে, দাদার ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে এলাম।

কেদার অস্বস্তি বোধ করে বলে, তোমার দাদা স্বাধীনভাবে যা খুশি করতে পারেন, আমি কৈফিয়ত চেয়েছি কিংবা সমালোচনা করেছি ভেব না কিন্তু।

তা জানি। আমিও কৈফিয়ত দিতে আসিনি। আপনার ভুল ধারণাটা দূর করা উচিত মনে করে এলাম।

আমার ধারণা নয়, আমি বলছিলাম দেশের লোকের কথা। সাহিত্যিক হোক বৈজ্ঞানিক হোক কেউ প্রতিভার পরিচয় দিলে সকলে তার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

আমিও তাই বলছি। প্রত্যাশা করে। কিন্তু সুযোগ দেয় না কেন ?

পরাধীন দেশে যতটা সম্ভব দেয়। প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে। দেশ-বিদেশে নাম হলে গর্ব বোধ করে।

কিন্তু যথেষ্ট টাকা দেয় না।

কেদার চুপ করে থাকে।

ঘুরে-ফিরে এই আসল প্রশ্নই যে উঠবে সে তো জানা কথা। অঞ্জলির বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

অঞ্জলি বলে, তা হলেই ত্যাগের প্রশ্ন আসে। আদর্শের জন্য আর্থিক কষ্ট বরণ করা। দাদার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। নতুন আবিষ্কার করবে, বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেবে, এ সাধ কি দাদার নেই ? কিন্তু দাদা বলে, সাধ থাকলে কী হবে, ওটা হবার নয় আজ এ চাকরিটা না নিলে কী হবে ? দু-চারবছর আদর্শটা আঁকড়ে থাকবে, তারপর একটা আপস করবে। বিদ্যাকে কাজে লাগাবে টাকা করার জন্য, আদর্শের একটা ঠাট শুধু বজায় থাকবে। এ রকম কত ঘটেছে।

একটু থেমে অঞ্জলি আবার বলে, দাদা বলে, ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা যার আছে তার কথা আলাদা, আমি পারব না, উপায় কী ? বিজ্ঞান-চর্চার নামে প্রতিভা বিক্রি করার চেয়ে চাকরি নিয়ে বিক্রি করাই ভালো।

কেদার বলে, আসলে দাঁড়াচ্ছে মনের জোরের প্রশ্ন। কিন্তু মনের জোর এমনি আসে না, সে জন্য মানুষকে ভালোবাসা চাই। খাঁটি আদর্শের মানেই হল দশজনের জীবনকে এগিয়ে দেওয়া। আদর্শের জন্য মানুষ যা করে সেটা ত্যাগ নয়, কর্তব্য।

অঞ্জলি বলে, ঠিক। যতই হোক, বৈজ্ঞানিক তো, বাজে সেন্টিমেন্টাল ওজোর দিয়ে নিজেকে ভুলায়নি। দাদা স্পষ্টই বলেছে, আমি কী করব ? কোনোদিন সে শিক্ষা পাইনি, সেভাবে মানুষ হইনি। আজ হঠাৎ আদর্শের নামে নিজেকে বদলে ফেলব কী করে ? কথাটা আমার ঠিক মনে হয়। বউদিকে দেখলেন তো ? আজ এ চাকরি না নিলে সারাজীবন বউদির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। নয়তো অন্যভাবে টাকা আনতে হবে।

অঞ্জলি হাসে।—দাদা আবার বউদি-অন্ত প্রাণ।

কেদার হেসে বলে, তবে তো কথাই নেই !

অঞ্জলি বলে, আসলে দাদা খাঁটি বৈজ্ঞানিক নয়। সে রকম বৈজ্ঞানিক হলে বউ নিয়ে এত বেশি মাততে পারত না।

কেদার আশ্চর্য হয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকায়। অঞ্জলি তামাশা করে কথাটা বলেনি। বিচার করে ধরতে পারুক না পারুক, সত্যটাকে মোটামুটি অনুভব করে ধরেছে।

অঞ্জলির বাইরের রূপটাই শুধু নয়, তার ভিতরেরও একটা বিশেষত্ব ক্রমে ক্রমে কেদারের কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল,—সহজ বাস্তব-বোধ।

হালকা ভাবপ্রবণতাই যার কাছে প্রত্যাশা করার কথা, তার মধ্যে ভাবপ্রবণতার ঘাটতিটা এমন বিস্ময়কর মনে হয় কেদারের !

তুমি এভাবেও ভাবতে পার অঞ্জলি ? তোমার মনটা তো বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে !

অঞ্জলির মুখের ভাব বদলে যায়।

শক্ত না হয়ে উপায় কী বলুন ? খুব সুন্দর হয়ে জন্মেছি যে ! এত রূপ নিয়ে জন্মালে তার দামটা দিতে হবে না ?

রূপের জন্য গর্ব বোধ করার বদলে রূপের বিরুদ্ধে তার নালিশ অভিভূত করে দেয় কেদারকে। ভেতরটা শক্ত হয়েছে কিন্তু শুকিয়ে যায়নি, ভাবাবেগ তার গভীর ও ঘন হয়েছে। বাস্তবতাকে মেনে নেবার ক্ষমতা জন্মেছে। তার মুখের ভাবে কথা বলার ভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ পায়।

কেদার মৃদুস্বরে বলে, আমি এদিকটা ভাবিনি।

অঞ্জলি বলে, অন্য মেয়ের যা হত মস্ত সম্পদ, আমার বেলা সেটাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গে বুদ্ধিটা যদি একটু ভোঁতা হত, কোনো কিছুর মানে তলিয়ে বুঝতে না চাইতাম, নিজের রূপের মোহ নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতাম জীবনটা। প্রেমের কথা এত শুনেছি,—পরস্পরকে নিয়ে যতবেশি মশগুল হওয়া যায়, জগৎ-সংসার ভুলে যাওয়া যায়, ততই নাকি প্রেম গভীর আর খাঁটি প্রমাণ হয়। কত বড়ো একটা মিথ্যা কথা চালু হয়ে আছে ! যার জীবনে বড়ো আদর্শ নেই, বড়ো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সাধ নেই, সেই শুধু ও রকম পাগল হতে পারে। একটা মেয়ের জন্য যে সব ভুলে যেতে পারে, সে কী মানুষ ? যার মনুষ্যত্ব নেই সে কী ভালেবাসতে পাবে ? আমায় নিয়ে যে যত পাগল হয়েছে, দেখেছি যে মানুষ হিসাবে সে-ই তত বেশি অপদার্থ !

আমিও একদিন পাগল হয়েছিলাম।

অঞ্জলি মিষ্টি করে একটু হাসে।

সে তো ছেলেমানুষি। আমিও তখন চাইতাম সবাই ও রকম পাগল হোক। পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পাগল করতে মজা লেগেছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখলাম, কই, কাজের মানুষ তো পাগল হয় না ? জীবনে যে বড়ো কিছু করতে চায়, সত্যিসত্যি আমার প্রেমে পড়লেও আমার খাতিরে সেটা খারিজ করতে রাজি হবে না।

কেদার বলে, শুধু তোমার কেন, কোনো মেয়ের খাতিরেই রাজি হবে না।

অঞ্জলি বলে, আমিও সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। অকর্মণ্য বাজে লোকের একটা নেশাকে প্রেম বলে চালানো হয়। সত্যিকারের মানুষের প্রেমে বাড়াবাড়ি থাকে না।

কেদার একটু হেসে বলে, তুমি উপন্যাসের কত বড়ো বড়ো নায়ককে অমানুষ করে দিলে জানো ?

মস্ত মানুষ সব। একটা মেয়ের জন্য যাদের জীবনটা পশু হতে বসে তারা আবার মানুষ ! আমার গা ঘিনঘিন করে।

কেদার হেসে বলে, আর যারা উলটোটা করে ? মাঝে মাঝে চুলের মুঠি ধরে পিটিয়ে দেয় ?

অঞ্জলি একটু হাসে।

কেদারের মনে আলোড়ন তুলে দিয়ে যায় অঞ্জলি।

জীবন্ত বাস্তব একটা মানুষ অঞ্জলির দাদা অনাদি, তার বিজ্ঞান-চর্চা ছেড়ে দেবার কাহিনি আরও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে তার নিজের জীবনের আগামী দিনের সমস্যাকে। তাকেও আপস করতে হবে, টাকার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে, গীতা ছাড়বে না !

কিন্তু তার আদর্শটা কী ?

বড়ো ডাক্তার হওয়া আর গীতাকে পাওয়ার চিন্তা এতদিন যেন চেতনাকে তার আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গীতার বাপের পয়সায় বিদেশে গিয়ে বড়ো ডাক্তার হয়ে এলে নীচের তলার আপনজনদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হবে, এতদিন এটাই ছিল তার কাছে আসল সমস্যা। শুধু গীতাকে অবলম্বন করে আরেকটি ডাক্তার পাল হয়ে এতকালের আত্মীয়বন্ধুদের ত্যাগ করে নতুন আত্মীয়বন্ধু খুঁজে নিয়ে যান্ত্রিক একঘেয়ে জীবনে সে কি সুখী হতে পারবে ?

আজ তার প্রথম মনে পড়ে যায় যে ও ভাবে বড়ো ডাক্তার হলে জীবনের কোন আদর্শটা যে তার ক্ষুণ্ণ হবে সে তা স্পষ্টভাবে জানে না !

ছেলেবেলা থেকে যাদের আপন বলে জানে তাদের ছাড়তে হবে—এটাই কী সব ?

সেবাব্রত তার আদর্শ নয়। ডাক্তার হয়ে বিনা ফি-তে রোগী দেখে বেড়িয়ে দেশোদ্ধারের স্বপ্ন সে দেখে না।

কিন্তু তার স্বপ্নটা কী ?

গীতাকে যদি সে বাদও দেয় জীবন থেকে, ওভাবে বড়ো হবার কল্পনা বাতিলও করে দেয়—আত্মীয়বন্ধু নিয়ে সাধারণ ডাক্তার হয়ে সাধারণ জীবনটাই সে যাপন করবে !

একটু ছোটো স্কেলে গরিব মানুষের স্তরে ডাক্তার পালেরই যান্ত্রিক স্বার্থপর জীবন !

দেশের গরিব মানুষ, নিপীড়িত অসহায় মানুষদের জন্য তার মমতা আছে। গীতা অঞ্জলি জ্যোতিদের আড়াল করে মাঝে মাঝে ট্রামের রুগ্ণা বউটি সদলবলে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, ঘরে ঘরে অচিকিৎসায় বিনা চিকিৎসায় মানুষকে রোগে ভুগতে আর মরতে হয় বলে প্রাণটা তার ক্ষোভে ভরে থাকে, কিন্তু ওদের জন্য কী করবে তা তো সে কখনও ভাবেনি !

অনাদি তবু জানে কোন আদর্শটা সে ত্যাগ করছে। ব্যবস্থা যতই ব্যাহত আর সংকুচিত হোক বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞান-চর্চা করাই যে তার কর্তব্য, এটা সে স্বীকার করে।

তারও কী শুধু এইটুকুই আদর্শ—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হয়ে ডাক্তারি করা ?

গীতার স্বামী এবং বড়ো ডাক্তার হলে গরিব রোগীদের মনে মনে মমতা করার সুযোগ হারাবে—এইটুকুই তার আপত্তি ?

নিজের এই নতুন চিন্তার ফাঁকে অঞ্জলির কথা তার মনে পড়ে।

অঞ্জলির জন্য সে মমতা বোধ করে। সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধ।

অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাই তার জুটেছে অনুমান করা যায়। তবে অঞ্জলি কাবু হয়নি।

কে জানে কী ভবিষ্যৎ অঞ্জলির ?

৭

কেদার বাড়ি ফিরতেই অমলা বলে, জানো দাদা, জ্যোতিকে আজ একচোট নিয়েছে পরিমলদা।

তার বেশ খুশির ভাব। জ্যোতি আজ শান্ত লাজুক শুচিবাইগ্রস্তা বউ হয়েছে কিন্তু তার আগেকার পাগলামি আজও অমলা ক্ষমা করতে পারেনি। বোধ হয় নিরীহ লাজুক বউ হয়েও বাছবিচার ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে সে যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, এটাও অমলার পছন্দ হয় না বলে !

কী হয়েছে ?

যা হবার তাই হয়েছে। এত ন্যাকামি মানুষের সহ্য হয় ? কিছুদিন ধরে কেমন একটু গম্ভীর গম্ভীব ভাব দেখছিলাম পরিমলদার। জ্যোতিকেও কেমন যেন মনমরা মনে হচ্ছিল। দুজনে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নিশ্চয়। আজ পরিমলদা আমায় আদা দিয়ে একটু চা করে দিতে বলেছিল, সর্দি হয়েছে। ওদের তো চায়ের পাট নেই, পরিমলদাই জোর করে বন্ধ করেছিল। জ্যোতি নিশ্চয় পরামর্শ দিয়েছিল। আমি চা করে নিয়ে গিয়ে পরিমলদার হাতে কাপটা দিয়ে ওদের বিছানায় একটু বসতে গেছি—জ্যোতি বললে কী, না ভাই বিছানায় বোসো না, তুমি রাঁধছিলে। শুনেই কী রাগ পরিমলদার ! একেবারে গর্জন করে ফেটে পড়ল। একটা মাতালের মেয়ে, ভদ্রতা জানে না, গেঁয়ো অসভ্য ভূত—যা মুখে এল তাই বলতে লাগল জ্যোতিকে। আমি যত বলি, থাক না পরিমলদা, ওতে কী হয়েছে—কে সে কথা শোনে !

জ্যোতি কী করল ?

আস্তে আস্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছু বলল না ?

না।

বেলা তখন এগারোটা বাজে। হর্ষের শরীরটা খারাপ থাকায় সে আজ তাকে একটি রোগীর কাছে পাঠিয়েছিল—যেখানে যাওয়া উচিত ছিল হর্ষের নিজের। রোগীর অবস্থা দেখে সে হর্ষকে ডেকে নিতে লোক পাঠিয়েছিল, হর্ষ যায়নি। বলে পাঠিয়েছিল যা কিছু দরকার কেদার করলেই হবে।

তার এই বিশ্বাসে খুশি হওয়ার বদলে কেদার বিরক্তই হয়েছে। কারণ, রোগীর আত্মীয়স্বজনেব ভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে হর্ষ যাই ভাবুক, এই ছোকরা ডাক্তারের উপর তাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। ওষুধ খাইয়ে ইনজেকশন দিয়ে দু-ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে রোগীকে লক্ষ করতে হয়েছে কেদারের। আবার সে বোধ করেছে অসহায় ভাব—হর্ষ ডাক্তারের রোগী যদি তার হাতে মারা যায় !

ক্রাইসিস্‌টা কেটে গেলেও খুশি হবার বদলে শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরেছে। খিদে পেয়েছে চনচনে।

অমলার কাছে জ্যোতির খবর শুনে সে শ্রান্তিক্লান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলে যায়।

ভাবে, এত তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া শুরু হল ?

অমলা বলে, তারপরে শোনো দাদা। সে এক অবাক কাণ্ড।

কেদার ভাবে, অমলাও আজকাল সাজিয়ে গুছিয়ে রস দিয়ে কথা বলতে শিখেছে !

অমলা বলে যায়, খানিক পরে বাজারে গিয়ে পরিমলদা মস্ত একটা ইলিশ মাছ আর মাংস কিনে নিয়ে এল। আমায় এ বেলা খেতে বলেছে।

ওদের দুজনেরই মাথা খারাপ।

আমায় কী বলল শুনবে ? বলল, কেদারকেও বলব ভাবছি, কিন্তু লজ্জা করছে। কেদার মাছ মাংস খাবে আর মনে মনে হাসবে।

কেদার সঙ্গে সঙ্গে বলে, যা, বলে আয়, আমিও খাব। খিদে পেয়েছে, রান্না হলেই যেন খবর পাই।

অমলা ঘরের বাইরে গিয়েছে, সে তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনে।

বলে, শোন, আগে বরং জ্যোতিকে জিজ্ঞেস করে আয়, আমি খেতে যাব নাকি। বলিস, আমি জানতে চেয়েছি।

অমলা একটু মুখ ভার করে চেয়ে থাকে।

কেদার বলে, এটা বুঝিসনে ? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার ব্যাপার, পরিমলকে খুশি করতে গিয়ে হয়তো জ্যোতির মনে কষ্ট দিয়ে বসব। হয়তো ওদের ঝগড়াটা উসকিয়ে দেব। বুঝলি না ?

অমলা ঠেস দিয়ে বলে, বুঝেছি। কার জন্য তোমার আসল দরদ তা আমি জানি।

অমলা গিয়ে জ্যোতিকে কী জিজ্ঞাসা করে আর কী বলে সেই জানে, জ্যোতি নিজেই জবাব দিতে তার সঙ্গে নেমে আসে নীচে।

যখন তখন সময়ে অসময়ে কেদারের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে যতক্ষণ খুশি কথা বলার পালা তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে। অন্য বাড়ি থেকে নির্জন দুপুরে সে এ বাড়িতে এসে কেদারের সঙ্গে কত কথা বলে গেছে—এ বাড়িতে বউ হয়ে আসার পর এমন সপ্তাহও গেছে ইতিমধ্যে কেদারের সঙ্গে যে সপ্তাহে মুখোমুখি দেখা পর্যন্ত হয়নি।

জ্যোতির মশলা-মাখা হাতে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ !

কপালে সে আজ সিঁদুরের ফোঁটা আঁটেনি।

কাছে এসে দাঁড়ায়। ম্লানমুখে হাসে।

অমলা দুজনেব মুখের দিকে তাকায়, অনিচ্ছুক কণ্ঠে বলে, আমি বরং যাই।

জ্যোতি বলে, না ভাই, যাবি কেন ?

কেদার চুপ করে থাকে।

জ্যোতি অমলাকে হাজির রাখতে চায়, তার মানেই সে আজ এখন প্রাণ খুলে কথা কইতে রাজি নয়। অমলার সামনে যে ভাষায় যে কথা বলা যায় শুধু সে ভাষায় সেই কথা সে বলবে।

কেদার ভাবে, তাই বলুক।

জ্যোতি বলে, কেদারদা, ও মানুষটাকে তুমিও বুঝতে পারনি, আমিও বুঝতে পারিনি। খড়কুটো স্রোতে ভেসে যায় দেখেছ ? সেই রকম মানুষ।

এতদিনে বুঝলি ?

বাবা কী আমাকে বুঝবার বুদ্ধি দিয়েছিল ? শুধু তেজ দিয়েছিল খানিকটা। যেটুকু বুঝলাম, যেমন বুঝলাম, তাই নিয়ে মরণ-পণ করলাম। কেদার বলে, জ্যোতি, আমার বড়ো খিদে পেয়েছে। তোদের ওখানে মাছ-মাংস খাব না নিজের ঘরে চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি খাব বলে দে। চান করে খেতে যাই।

অপমানে কালো হয়ে যায় জ্যোতির মুখ।

তবু সে সতেজে বলে, আমি মাছ-মাংস রাঁধব, তুমি খাবে না ? তুমি এখুনি চান করে এসো। ওনার ফিরতে দেরি হলে আগে আমি তোমায় খাইয়ে দেব।

অমলা বলে, আমার খিদে পায় না ?

তুই-ও আয় না ?

বোনেদের তেলের শিশি থেকে একটু নারকেল তেল মাথায় দিয়ে, রান্নার সরষের তেল থেকে কয়েক ফোঁটা নিয়ে গায়ে এখানে ওখানে ঘষে কেদার স্নান করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় আর ভাবে, নিষ্ঠা দিয়ে কী হয় ? যা চাই আদায় করে কী হয় ?

ভাবে, কাজ নেই আর বড়ো কথা ভেবে, তেজ দেখিয়ে। ডাক্তারি পাশ করেছে, ডাক্তারি ব্যবসায়ে বেশ দু-পয়সা আসবে, তাই নিয়ে খুশি থেকে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।

স্নান করে কিন্তু সে বসে থাকে। পরিমল ফেরবার আগে ওপরে গিয়ে জ্যোতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসবার মতো তেজ নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না।

পরিমল ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরেই। নীচের তলা থেকেই কেদার শুনতে পায় তার কর্কশ চিৎকার—রান্না হয়েছে ?

জ্যোতি বোধ হয় কেদারের নিমন্ত্রণ গ্রহণের কথাটা তাকে জানিয়ে দেয়। কারণ, খানিক পবে পরিমল নীচে এসে বলে, চান করেছ ? এসো তবে বসে পড়ি।

এইমাত্র যার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গিয়েছিল, এখন তাকে খুব শান্ত মনে হয়। মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। এটা প্রায় স্থায়ী হয়ে উঠেছে আজকাল।

আসন পেতে দিয়ে মায়া বলে, কেদারদার কল্যাণে আজ অনেকদিন বাদে একটু মাছ-মাংসের স্বাদ পাব। এবার থেকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করতে হবে আপনাকে।

পাশাপাশি তারা বসে। দুটি কার্পেটে বোনা আসনে—একটিতে লেখা 'জয় গুরু অন্যটিতে 'হরেকৃষ্ণ'।

পরিবেশন করে জ্যোতি।

পরিমলের মা একবার সামনে এসে দুটো কথা বলে সেই যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে, আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। মুখখানা তার ঘন মেঘে ঢাকা আকাশের মতো গম্ভীর।

জনার্দনও তার ঘর থেকে বার হয় না।

কেদার বলে, আবার তাহলে মাছ-মাংস ধরলে ?

হ্যাঁ, নইলে খাব কী ? যত-সব ধাপ্পাবাজির ব্যাপার। বলে কিনা তোমার যেমন পেশা তার সঙ্গে সব কিছুর সামঞ্জস্য করতে হবে, খাওয়া দাওয়া বেশভূষা রীতিনীতি মানিয়ে নিতে হবে। হিন্দুমতে চিকিৎসা করবে, তোমার কী স্বেচ্ছাচার মানায় ? লোকে শ্রদ্ধা করবে কেন, তোমার সাধনা সফল হবে কেন ! নিজের পেশায় তোমার নিজের বিশ্বাস আসবে কেন, মনে জোর পাবে কোথা থেকে। যত সব হাম্বাগি কথা। এখনও যেন সে সব দিন আছে, লোকে দেখতে আসছে বাড়িতে তুমি কী খাও আর কী কর—দেখে তবে তোমার ওষুধ খাবে।

বুকে অনেক কথা জমেছে পরিমলের, একটু আলগা দিতেই গড়গড় করে বেরিয়ে আসে !

কেদার বলে, এ সব বলেছিল কে ?

উনি বলেছিলেন। সব ব্যাপারে কর্তালি আর বাহাদুরি করা চাই তো !

কেদার হেসে বলে, তুমি যে সব ফাঁস করে দিলে পরিমল ! বিয়ের আগে থেকেই হুকুম মেনে আসছ তাহলে ?

পরিমল গরম হয়ে উঠেছিল, তার পরিহাসে লজ্জা পেয়ে সেও একটু হাসে। একটু সহজ হয়ে আসে পরিবেশ। যদিও জ্যোতির ওপর তার গভীর বিরাগটাও ফাঁস হয়ে গেছে তার কথায়, সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কেদার ভেবেচিন্তে বলে, জ্যোতির কী হয়েছে জানো ? মধ্যবিত্তের ঘরে নিয়মনিষ্ঠার অভাবটা ওর অসহ্য ঠেকত। সেকালে যেমনই হোক সংসারে আচারবিচার নিয়মনীতি বাঁধা ছিল—আমরা সে সব প্রায় ভেঙে দিয়েছি অথচ সে জায়গায় নতুন কিছু তৈরি করিনি। তার ফলে আমাদের ঘরে ঘরে অনিয়ম বিশৃঙ্খলা আর বিরোধ। হর্ষকাকার ড্রিঙ্ক করার হ্যাবিটটার জন্যই জ্যোতির বিতৃষ্ণা আরও বেড়ে গেছে। ও এখন পুরোনো চালচলন চায়। ওর ধারণা, ব্রতপুজো আচারনিষ্ঠা নিরামিষ খাওয়া এ সব হলে সংসারে সুখশান্তি বজায় থাকে।

তাই কি হয় ?

কিছুতেই হয় না। নতুন অবস্থা জীবনে নতুন বিরোধ সৃষ্টি করেছে, পুরোনো দিনের চালচলন দিয়ে কী সে বিরোধ ঠেকানো যায় ? বেচারির উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, কিন্তু ছেলেমানুষ তো !

পরিমল ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ছেলেমানুষ !

মাছের পাত্র হাতে জ্যোতি সামনে দাঁড়িয়ে, পরিমলের ঝাঁঝালো ব্যঙ্গোক্তি তার কানে কেমন হয়ে বাজে সেই জানে।

কেদারের পাতে মাছ দিতে দিতে সে বলে, ছেলেমানুষ আমার রান্না খারাপ হলেও নিন্দে করতে পাবে না কিন্তু।

পরিমলকে বলে, শুধু মাছ দিয়ে পেট ভরিয়ো না। মাংস আছে।

কেদার মুগ্ধ হয় না।

সে জানে, এটাও জ্যোতির একগুঁয়েমি। স্বামী-ভক্তিপরায়ণা শান্ত নিরীহ বউয়ের ভূমিকা সে অভিনয় করে যাবেই—স্বামী জুতো মারলেও বিচলিত হবে না। অথচ মুখ দেখে বেশ বোঝা যায় ভিতরে তার ঝড় উঠেছে। কিন্তু বাইরে সে তার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেবে না। কথাটা সত্যি। সে শুধু তেজ শিখেছে। তেজ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।

জ্যোতির রান্না হয়েছে চমৎকার। খিদেও কেদারের ছিল জোরালো। তবু মাছ-মাংস তার মুখে বিস্বাদ লাগে।

কোথায় গিয়ে ঠেকবে জ্যোতি ?

কেদারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ জ্যোতি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সৃষ্টি করে নেয়।

কেদারকে বলে, আমি দুপুরে বাবার ওখানে যাব। আমি যাওয়ার খানিক বাদে তুমিও এসো অনেক কথা আছে।

কথা তোর চিরদিন থাকবে।

কী করব ? বুদ্ধি যে কম। ভাবি এক রকম, হয় আরেক রকম।

এত কাছে বাপের বাড়ি, সেখানে যেতে জ্যোতি জমকালো শাড়ি পরে। অবশ্য সাধারণভাবেই পরে।

যাবার সময় বলে, একলা যেতে দিতে শাশুড়ি আপত্তি করছিলেন ! কী অদ্ভুত ব্যাপার বলো তো সংসারে ? কত শতবার একলাটি এসেছি গিয়েছি, কোনো দোষ হয়নি, আজ বিয়ে হয়েছে বলে আর একলা যাওয়া উচিত নয়।

তোর বুদ্ধি সত্যি কম। এই সোজা কথাটা বুঝিস না ?

আরও কিছু বুঝবার আছে না কি ?

আছে বইকী। বিয়ে হওয়ার জন্যে কি তোর একলা যাওয়া আসা দোষের হয়েছে ? মাসিমার কাছে এটা আগেও দোষের ছিল কিন্তু তখন কিছু বলার অধিকার ছিল না। এখন তুই ছেলের বউ, এখন আপত্তি করার অধিকার জন্মেছে।

জ্যোতি সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ।

কিছুক্ষণ পরে কেদার ও বাড়ি যেতেই মোহিনী বলে, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে কেদার। ডাকতে পাঠাব ভাবছিলাম। আমার বাঁ হাতটায় কী হয়েছে দ্যাখো দিকি। হাতে জোর পাই না, আঙুলগুলি সোজা করতে কষ্ট হয়।

হর্ষকাকাকে দেখাননি ?

ওকে আবার কী দেখাব !

কেদারের যেন তাক লেগে যায় !

মনে পড়ে, দরকার হলে সুন্দরীও কখনও ডাক্তার পালকে বলে না আমার কী হয়েছে দ্যাখো তো—ডাক্তার পালের কোনো বন্ধু-ডাক্তারকে দিয়ে নিজের চিকিৎসা করায় !

কেদার সবে পরীক্ষা শুরু করেছে, জ্যোতি এসে বলে, মা, তুমি কি আর কেদারদাকে হাত দেখাবার সময় পাবে না ? কেদারদা পালিয়ে যাবে ? আমাকে শিগগির ফিরতে হবে, দরকারি কথাগুলো সেরেনি ?

মোহিনী হাতটা টেনে নিয়ে বলে, তাই নে বাছা, তাই নে। কীসেব যে তোর অত দরকারি কথা !

কেদার একটা সিগারেট ধরায়। জ্যোতির অধৈর্য ভাব তাকে আরও চিন্তিত করে দিয়েছে।

জ্যোতি বসতেই সে তাকে বলে, তোকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে ? এত সব যে করছিস পরিমলের জন্য, বাড়ির টাকা পর্যন্ত চুরি করে দিচ্ছিস তোর ওপরে অশ্রদ্ধা জন্মে যাবে না ? তুই বলেছিলি, যাব জন্য চুরি করলাম সে কখনও চোর বলতে পারে ! সংসারে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু করলে তার ফল ফলবেই, এখন সেটা বুঝতে পারছিস তো ?

তুমি নীতি কথা শুরু করলে কেদারদা। অবস্থাটা বিচার না করেই সরাসরি বলছ কাজটা অন্যায় হয়েছিল। তোমরা তো দরকার হলে পেটের মধ্যে ছেলেকে মেরে ফ্যালো—সেটা কী খুন করা হয় ? ও সব করেছিলাম বলে কিছু হয়নি। সব কথা শোনো আগে, তবে তো বুঝতে পাববে।

কেদার লজ্জা পেয়ে ভাবে, আজও জ্যোতিকে এঁটে উঠবার সাধ্য তার হয না। সব কথা না শুনে একটা মন্তব্য করে বসা সত্যই তাব উচিত হয়নি।

জ্যোতি খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসল ব্যাপার কী দাঁড়িয়েছে জানো ? মোটে পসার হচ্ছে না। রোগীপত্র কিছু কিছু হয়, ওষুধপত্রও বিক্রি হয়, কিন্তু পয়সা নেই। বেশিব ভাগ গরিব বোগী, অল্প পয়সায় চিকিৎসা সারতে চায়। বোজগার হচ্ছে না, সে দোষটা এখন চাপছে আমার ঘাড়ে। আমি বলেছিলাম এ রকম করো, ও বকম করো—তাতে সুবিধে হচ্ছে না, কাজেই দায়ি হলাম আমি।

কিন্তু পরিমল জানে না, খুব নামটাম না হলে কবিরাজিতে বেশি পয়সা নেই ! সাধারণ একজন ডাক্তারেব চেয়ে সাধারণ কবিরাজের আয় ঢের কম ?

সেই জন্যই বলছে টাকাটা অন্যভাবে লাগালে ভালো হত। ভালো দোকান করার বদলে একটা ওষুধ বার করে। বিজ্ঞাপন দিলে নাম হত, পয়সাও হত।

তার মানে লোক-ঠকানো ?

তাই তো বলছে। প্রথমে অনেক বড়ো বড়ো কথা ভেবেছিল, সব নাকি বাজে। খাঁটি ওষুধ দিতে হলে বেশি দাম পড়ে—লোকে কেনে না। অনেক রোগীর টোটকা চিকিৎসাও করতে হয়। লোক না ঠকিয়ে উপায কী ?

কেদারের মুখ কঠিন দেখায়।

বিয়ের আগে তো এ সব কথা বলেনি ? ক-মাসে জ্ঞান জন্মে গেছে, না ?

আমার কথা শুনে চলত কি না।

তা তো চলবেই। নইলে কী এত বড়ো ডাক্তারের এমন মেয়েটিকে বাগানো যায়—এতগুলি টাকা মেলে ?

জ্যোতি নতমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

তা নয় কেদারদা। মানুষটা ও রকম নয়। তোমরা টের পাওনি, কেবল আমার দিকটা দেখেছিলে, নইলে ও মানুষটাও কম পাগল হয়নি। ওভাবে ঠকায়নি, টের পেয়ে যেতাম না ? মুশকিল হল, আমরা অন্য দিকগুলো হিসেব করিনি। সংসারে শুধু প্রেম নিয়ে চলে না।

অঞ্জলির কথা মনে পড়ে যায় কেদারের। অঞ্জলিও এই সত্য আবিষ্কার করেছে শেষ পর্যন্ত। প্রেমকে যারা বাস্তব জীবনের চেয়ে বড়ো করে তোলে, জীবনের আর সমস্ত সার্থকতা তুচ্ছ হয়ে যায় যাদের কাছে, মানুষ হিসাবে তাদের বেশি মূল্য নেই !

নারীপুরুষ নির্বিচারে এই নিয়ম।

কত সোজা কথাটা ! অবাস্তব প্রেমের মূল্য কতটুকু ! সেই প্রেমের দামে সস্তা মানুষ ছাড়া কে নিজেকে বিলিয়ে দেবে !

জ্যোতি তার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলে, এখনও আসল কথায় আসিনি কেদারদা। এতক্ষণ তো শুধু কীসে কী হয়েছে বললাম।

আসল কথাটা কী ?

আমায় বলছে বাবাকে ধরে ব্যবস্থা করে দিতে। আরও কিছু টাকা পেলে গুছিয়ে নিতে পারবে। কোন মুখে বাবাকে আবার বলব বলো তো ?

হর্ষকাকার টাকা কই ? রোগীও কমিয়ে দিয়েছেন---ডাকলে যান না।

মুশকিল কী হয়েছে জানো ? আমি বললে বাবা দেবে—যেভাবে পারে জোগাড় করবে। ও মানুষটাও তা জানে। মনে মনে কী বলছে বুঝতে পারি। এই বুঝি তোমার ভালোবাসা, আমার জন্য এটুকু করতে পারবে না ? আমি কোন মুখে বলব সেটা ভাবে না। কত হম্বিতম্বি করেছি, কবিরাজ কী মানুষ নয়, আমায় সুখে রাখতে পারবে না ? আজ গিয়ে উলটো গাইতে পারি আমি ?

এই নিয়ে ঝগড়া হয়েছে ?

না। ঝগড়া ঠিক নয়। আমি যা বলছি ঠিক তার উলটোটা করছে। সর্বদা বিরক্ত ভাব, যখন তখন সামান্য ব্যাপারে চটে যাচ্ছে। তবে আসল কারণ ওটা।

কেদার ভেবেচিন্তে বলে, হর্ষকাকাকে বলবি তাছাড়া উপায় কী ?

কেদার শুধু জ্যোতির দিকে হিসেব করে না, হর্ষের কথাও ভাবে। ঘর সংসার সম্পর্কে হর্ষের উদাসীনতা বাড়ছে, আদুরে মেয়ের জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করতে গিয়ে এ ভাবটা যদি কেটে যায় !

জ্যোতি বলে, আমি পারব না।

কিন্তু—

কিন্তু জানি না। আমি মরে গেলেও বাবাকে বলতে পারব না।

সেই তেজি জ্যোতি ! তেজ তার এখনও যায়নি !

কেদার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, তুই আবার মাছটাছ খাওয়া ধরেছিস ?

না।

যত রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলি সব বজায় রেখেছিস ?

সব।

কেদার একটু ভেবে বলে, তোর ইচ্ছা আমি হর্ষকাকাকে বলি ? জ্যোতি চুপ করে থাকে।

আমি পারব না জ্যোতি।

আমিও তাই ভাবছিলাম। এ কী মানুষ পারে ?

বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরেই একটু বসে কেদার। মনটা একটু গুছিয়ে ব্যাগ নিয়ে ডিসপেনসারিতে যাবে।

ভেতরের বারান্দায় মেয়েদের গল্প হচ্ছে শুনতে পায়। মায়া আর তার মা নীচে এসেছে।

মোহিনী বলে, এমন বউ জুটেছে বলব কী তোমাকে। একলাটি গটগট করে বাপের বাড়ি চলে গেল। সধবা মানুষ, মাছ খাবে না। যতদিন পরিমল বাড়িতে মাছ আসতেই দিত না, কেউ খেত না, তখন না খেয়েছিস আলাদা কথা। পরিমল আবার মাছ ধরেছে, কিন্তু বউয়ের ধনুক-ভাঙা পণ। একবার যখন ছেড়েছে আর ধরবে না।

মায়া বলে, দাদার মনটাও বিগড়ে গেছে। বিয়ের সময় পণ নিল না, এখন টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে। একটা ওষুধ বার করেছে, বাজারে ছাড়লেই ঢের লাভ হয়—কিন্তু ছাড়বে কী দিয়ে ? টাকা কই ? কত টাকা ধার করে দোকান খুলেছে, আবার কোথা থেকে ধার পাবে ? বাবা শ্বশুরের কাছে চাইতে বলছিল। দাদা রাজি হয় না। বউদি যে রাগ করবে।

কয়েক মিনিট পরে জ্যোতিও ফিরে আসে। তখনও বারান্দায় তাকে নিয়েই আলোচনা চলছিল।

জ্যোতি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই চুপ হয়ে যায়।

জ্যোতির স্পষ্ট দৃঢ় গলা শোনা যায়, একটা ভালো খবর আছে মা। একলাটি গেলাম বলে তোমরা রাগ করেছ। আমি কী নিজের গরজে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম ?

মায়া বলে, কী খবর বউদি ?

জ্যোতি বলে, তোমার দাদার ওষুধটা বাজারে দেবার জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মা বলেছে আগেই ক-খানা গয়না আমায় দিয়ে দেবে, বাকিটা পরে পাব।

কেদার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পথে নেমে যায়।

হাসবে না কাঁদবে সে ভেবে পায় না।

এবারও জ্যোতি কারও ভরসায় না থেকে নিজে হাল ধরেছে।

এবারও সে হার মানিয়েছে কেদারকে।

এই মেয়েকে যদি ছেলেবেলা থেকে সংসারের স্রোতে গা ভাসিয়ে বেরিয়ে বড়ো হতে না দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করা যেত, তার এই অবাস্তব মিথ্যা প্রেমের চেয়ে ঢের বড়ো বড়ো সার্থকতা জীবনে আছে এ চেতনা জাগানো যেত—কত দিক দিয়ে সে ধন্য করতে পারত নিজেকে আর সমাজ জীবনকে ?

হর্ষের সেই রোগীটিকে দেখতে যেতে হবে।

কেদার এ বেলা হর্ষকে পাঠাবার চেষ্টা করে। বলে, ওরা আপনাকেই চায় কাকা। আপনার গিয়ে দেখে আসা উচিত।

তুমিই তো বেশ চালাচ্ছ। ক্রাইসিসটা পার করিয়ে দিয়েছো।

তবু—

আর অত পারিনে বাবা। এ রোগীটা ভালো করলে, এবার থেকে ওরা তোমাকেই ডাকবে।

হর্ষ হাসবার চেষ্টা করে।

## ৮

রোগী মারা গেছে। কিন্তু উপায় কী ? ক-দিন পরে মায়ার কাছে টাকা চায়। বলে, আমি ডেকেছি বলে এমনি এসেছিলেন, নইলে আগে ফি না নিয়ে বেরোতেন না।

না ডাকলেই হত ডাক্তার পালকে।

তোমার বন্ধুকে বাঁচাবো বলেই ডাকা হয়েছে।

ও সময় কারও মাথার ঠিক থাকে ? কী লাভ হল ডাক্তার পালকে এনে ?

কেদার তিক্তকণ্ঠে বলে, ডাক্তার আনলে কী রোগী মরে না ? শেষ নিশ্বাস পড়া পর্যন্ত বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে রোগীকে। আমি কথা দিয়েছি পুরো ফি দেওয়া হবে।

মায়া বলে, এত টাকা এখন কোথায় পাবে বীণা ? রোগীকে বাঁচাতে পারল না তবু গরিবের কাছে এত টাকা কোন মুখে নেবে ? এর চেয়ে গোড়া থেকে দাদাকে দেখালেই ভালো হত।

কেদার চুপ করে থাকে।

হয়তো বেঁচেও যেত দাদার চিকিৎসায়।

মুখ কালো হয়ে যায় কেদারের।

ডাক্তার পালের তিরস্কার তার প্রাণে বিঁধে গিয়েছিল। জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারে কি না সন্দেহ।

তার আত্মবিশ্বাস নেই, সে সাহস পায়নি ! সেও ভেবেছিল ওই ইনজেকশনটা দেবার কথা, কয়েক ঘণ্টা আগে সেটা দিলেই যে বিজন বেঁচে উঠত এমন কোনো কথা নেই—কিন্তু ডাক্তার পালকে ডেকে না এনে তার তো সত্যই সাহস হয়নি ইনজেকশনটা দিতে !

কেন এ ভীরুতা ?

কিন্তু সত্যিই কী এ ভীরুতা ? আত্মবিশ্বাসের অভাব ? অথবা এর কারণ তার শিক্ষাদীক্ষার গলদ ?

রোগী মরবে কী বাঁচবে সে বিষয়ে নির্বিকার থেকে ডাক্তার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করে যাবে, ডাক্তার পালের এ কথায় কিছুতেই সায় দিতে চায় না কেদারের মন।

ডাক্তার পালের পসারটাই টিকে থাকে কই এই নীতি পালিত হলে ? দু-টাকা চার-টাকা ফি-এর ডাক্তার যদি এই নীতি মেনে চলে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করে চিকিৎসা চালিয়ে যায়, রোগীর মরণ-বাঁচন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে, রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়ালেও ডাক্তার পালকে ডেকে তার মত নেবার প্রশ্নটাও যে তাহলে বাতিল হয়ে যায়।

ক-জন রোগী সোজাসুজি চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পালের কাছে যায় ? দু-টাকা চার-টাকার ডাক্তাররাই আগে চিকিৎসা শুরু করে, তাদের চিকিৎসাতে নির্ভর করেই বাঁচে মরে বেশির ভাগ রোগী। তাদের কাছ থেকেই বেশির ভাগ ডাক জোটে ডাক্তার পালের।

কেদার টের পায়, ডাক্তার পালের টাকাটা তার নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

তার যে টাকার কী টানাটানি সেটা সে আরেকবার অনুভব করে তীব্রভাবে।

নিজের ভালোমানুষি ছেলেমানুষির উপর তার ধিক্কার জন্মে যায়। আর সব ভুলে গিয়ে রোগীকে বাঁচাবার আদর্শটা আঁকড়ে থেকে লাভ তো তার হল এই। রোগীর চিকিৎসা করে নিজে তো একটি পয়সা পেলই না, ডাক্তার পালকে ডেকে আনার খেসারতটাও দিতে হবে তার নিজের পকেট থেকে !

দু-চারদিনের মধ্যে সে টের পায় শুধু এইটুকুই নয়, আরও একটা লাভ তার হয়েছে এই যে বিজনের মৃত্যুর জন্য মায়া তাকে দায়ি করে তার ওপর ভীষণ চটে গেছে।

সুধীরকে নিয়েও বিপদে পড়েছে কেদার।

দামি দামি ওষুধ দেয় কিন্তু কোনোই যেন ক্রিয়া দেখা যায় না ওষুধের। চিকিৎসা আরম্ভ করার আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি অবনতি ঘটতে থাকে সুধীরের।

রোগটা টের পাবার পর মানসিক আতঙ্কের ফলে প্রথম কয়েকদিন এ রকম হতে পারে। কিন্তু মানসিক ভয়-ভাবনা তো ওষুধের ক্রিয়া বাতিল করে দিতে পারে না। কোনো মানেই তাহলে থাকে না চিকিৎসার।

স্পেশালিস্ট বলে, কী ব্যাপার কেদারবাবু ? ডিরেকশনগুলি ঠিকমতো সব মানা হচ্ছে তো ?

আমি নিজে সব দেখছি সার।

তবে ?

হর্ষ শুনে বলে, ওষুধ কোথা থেকে নিচ্ছ ?

ওরাই কিনে আনে।

তুমি কিনে দিয়ো।

কিন্তু ততদিনে বিশ্বাস ও ধৈর্য ভেঙ্গে গেছে সুধীরের আত্মীয়স্বজনের। তার বাবা ভবেশ সবিনয়ে বলে, তোমার হাতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না কেদার। আমরা ওকে হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেব।

যেন কেদারের হাতেই ছিল সুধীরের প্রকৃত চিকিৎসার ভার। সে যেন গোড়াতেই হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলেনি, সুধীরের আত্মীয়স্বজনের পরিবর্তে সেই যেন বাড়িতে রেখে তার চিকিৎসা করাতে চেয়েছিল।

কিন্তু সত্যই কী সে দায়ি নয় একেবারে ? স্পেশালিস্টেব নির্দেশ পালনের দায়িত্ব কী ডাক্তারের মতো পালন পরার বদলে যন্ত্রের মতো পালন করেনি ? প্রত্যক্ষভাবে সেই তো তদ্‌বিব করেছে সুধীরের, নিজের হাতে তার দেহে প্রয়োগ করেছে ওষুধ। ডাক্তার হয়ে তার যদি খেয়াল না থাকে যে মানুষের বাঁচন-মরণ যে ওষুধের ওপর তা নিয়েও চলেছে ভেজালেব কারবার, সুধীরের অনভিজ্ঞ আত্মীয়স্বজন সেটা কী করে খেয়াল রাখবে, সাবধান হবে ?

সেই দিন রাত্রে কেদার ঘুমোতে যাবে, নগেন বিশ্বাস এসে একেবারে তাব পা জড়িয়ে ধরে।

আমার ছেলেটাকে বাঁচাও বাবা।

পঞ্চাশ বছর বয়সে নগেনের মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, জীর্ণ-শীর্ণ শবীরটা বাঁকা হয়ে গেছে অভাবের চাপে।

এই গলি থেকে বেরিয়েছে আরও সবু অন্ধকার গলি। তাবই মধ্যে একটা একতলা বাড়িব একখানা ছোটো কোটরে ভাঙ্গা বাক্‌সো-প্যাঁটরা ছেঁড়া তোশক বালিশ নিয়ে বাস করে নগেনের পরিবার।

দশ-এগারোবছরের ছেলে। হিক্কা তুলতে তুলতে বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় কেদারের।

ক-দিন হল ?

আজ এগারো দিন।

কে দেখেছিলেন ?

নগেন কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, ডাক্তার দেখাবো কোথা থেকে বাবা ?

অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে দেখবে কী একবার ? কেদার ভাবে সে যদি শেষ মুহূর্তে এই ছেলেটার চিকিৎসার ভার নেয়, একে বাঁচাবার জন্য সম্পূর্ণরূপে সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপব নির্ভর করতে পারবে, বাধ্য হয়েই নির্ভর করতে হবে তাকে। অন্য কোনো ডাক্তার ডাকার প্রশ্নই নেই, হাসপাতালে পাঠাবার সময় বা অবস্থাও নেই ছেলেটার, যা কিছু করা সম্ভব তার নিজের করা ছাড়া উপায় নেই।

ছেলেটা মরে গেলে নিজের বিবেকের কাছেও তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

একটা ঝোঁক চেপে যায় কেদারের। স্লিপ পাঠিয়ে সে হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে ওষুধ আনায়। ওষুধ কেনার পয়সা পর্যন্ত নগেনের হাতে নেই। পরে যেভাবে পারে ওষুধের দাম দিয়ে দেবে জানাতে গিয়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলে।

সারারাত জেগে কেদার লড়াই করে ছেলেটার জীবন রক্ষার জন্য।

বাইরে ভোরের আলো ফোটে, ঘরে তার আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। তখনও ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে ভেবে নতুন ডাক্তার কেদারের হৃদয় গর্বে ভরে যায় বটে কিন্তু মনে মনে সে ভাবে যে গীতা তার এ রকম ডাক্তারি করার খবর পেলে কী বলবে ।

সকালবেলাও ঝোঁকটা তার কাটতে চায় না।

বাঁচবে কী মরবে ছেলেটা সুনিশ্চিত হয়ে যায়নি। মরার সম্ভাবনাটাই বেশি। সে এসে না পড়লে যে মরণটা এসে যেত আধঘণ্টার মধ্যে, সে শুধু সেটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত এবং আরও কিছু সময়ের জন্য।

এখন ওকে হাসপাতালে পাঠানো সম্ভব।

কেদারের প্রবল ইচ্ছা জাগে, নিজেই সে লড়াই করবে শেষ পর্যন্ত, ছেলেটা বাঁচবেই না এমন তো নয়, এখন বরং আশা করা যায় যে বেঁচেও যেতে পারে।

হাসপাতালে না পাঠিয়ে এখানে রেখে নিজে সে ওকে বাঁচাতেও পারে।

জোর করে ইচ্ছাটা দমন করে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে নিজে সঙ্গে গিয়ে পরেশকে কেদার হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসে।

বিকেলে ঘরে বসে আছে কেদার। ভাবছে বেরোবার কথা। গীতা ডেকে পাঠিয়েছে, একবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া দরকার। যাবার সময় পরেশের খবর নিয়ে যাবে। ছেলেটার মরণকে ঠেকানো যদি না যায়, উপায় কী। সে জন্য নিজের সব কাজ বন্ধ করে ঘরে বসে থেকে লাভ নেই।

ক-দিন খাটুনি গিয়েছে বেশি রকম। কাল রাত্রি জাগতে হয়েছে। সারাদুপুর ঘরে বিশ্রাম করে একটু ভালো লাগছে কেদারের। শরীর খারাপ হলে মন তার অল্পে বেশি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এটা কতকাল ধরে কতবার কত ব্যাপারে সে লক্ষ করেছে, অথচ প্রয়োজনের সময় খেয়াল থাকে না। ক্ষোভদুঃখের পরিমাণটা যখন বড়ো বেশি মনে হয় দেহের দুর্বলতার জন্য, তখন কথাটা স্মরণ করে অনুভূতিকে সংযত করার চেষ্টা করতে ভুল হয়ে যায় কেন কে জানে !

পাশের বাড়ির দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ন্ত রোদের রঙিন আলো ঘরে এসে পড়েছে ঘুপচি জানালা দিয়ে। সিগারেট নেই।

না থাক, সিগারেট ছাড়াও তার চলবে।

মায়া এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, কেদারদা, একটা খারাপ খবর আছে।

চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই মায়া চিরকাল তার সঙ্গে কথা কয়। কখনও ঘরের ভেতরে এক পা আসে না। দু-চারমিনিটের বেশি কথাও বলে না কখনও। বাজেবাজে কথা বলে না একেবারেই। কেদার বুঝতে পারে মায়া খোঁচা দিতে, ঝাল ঝাড়তে এসেছে।

খারাপ খবর ? কী খবর মায়া ?

নগেনবাবুর ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়েছিল জানেন তো ?

কী হয়েছে ?

কেদার জানে কী হয়েছে। তাই শান্তভাবেই প্রশ্ন করে।

মারা গেছে শুনলাম।

কখন ?

ও বেলা, হাসপাতালে নেবার কিছুক্ষণ পরেই। দাদা শুনে এসে বলল।

পরিমল বাড়ি আছে ? একবার আসতে বলবে ?

দাদা আসছে।

পরিমল আসছে। দু-চারমিনিটের মধ্যে সে-ই এসে খবরটা দিত কেদারকে। তবু নিজে এসে আগে খবরটা না জানিয়ে চলল না মায়ার ! অথচ মায়াকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে। ছুটে এসে খবর দেবার মতো উত্তেজনার তাগিদ তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।

ওকেও বাঁচাতে পারলেন না ?

মায়ার স্বর বড়ো তীক্ষ্ণ শোনায়।

বাঁচল কই ?

বাঁচবার আশা ছিল না বলে বুঝি আপনি চলে এলেন ?

জবাব না পেয়ে মায়া বলে, সুধীরেরও বুঝি কিছু করতে পারলেন না, তাই হাসপাতালে পাঠাতে হল ?

এবারও কেদার চুপ করে থাকে।

পরিমল ঘরে এসে বসে। মায়া চলে যায়।

নগেনবাবুর ছেলেটা মারা গেল। হাসপাতালে নেবার আধঘণ্টাব মধ্যে। হাসপাতালে সময় মতো গেলে বাঁচানো যেত। গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়নি।

এগারো দিন শুধু টোটকা চিকিৎসাই চলছিল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে।

পরিমল বলে, যন্ত্রের মতো চিকিৎসা কবার শিক্ষাই পাই আমবা ডাক্তার-কবিরাজরা। শিক্ষাটা তাই অসম্পূর্ণ থাকে। মনেরও শিক্ষার দরকার ওই সঙ্গে। বিদ্যা যদি না কাজে লাগে তাব দাম কী ? কিন্তু সে ব্যবস্থা নেই। এটা তারই ফল।

কেদার সায় দেয়।

শুধু কী এই একটা ? কত অন্যায় আর অসঙ্গতি যে চোখে পড়ছে একে একে। এদিকটা আমাদের ভাবতেও শেখানো হয় না। অন্তত একটু সূত্র ধরিয়ে দিলে গোড়ার দিকে অনেকে নিজে নিজেই ভেবেচিন্তে এ সব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে পাবে। গোড়ায় একটু ইঙ্গিত পর্যন্ত পাই না আমরা।

সত্যি বড়ো বিশ্রী ব্যবস্থা। শিক্ষার শেষে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে নতুন শিক্ষা পেতে হয়, আগের শিক্ষাদীক্ষা ধারণা বিশ্বাস অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো সংস্রব থাকে না তার।

বাস্তবকে বাদ দিলে শিক্ষা এই রকমই হয়।

সামঞ্জস্য ঘটাতে মাথা বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়।

বিদেশে শুনেছি এ রকম খাপছাড়া শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সোভিয়েটে নাকি সামাজিকভাবে কাজে লাগে না এমন কোনো শিক্ষাই নেই। সেখানে সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষাটা একজনের পেশা না হয়ে যাতে দশজনের কাজে লাগে।

ধীরে ধীরে তারা কথা বলে, থেমে থেমে। এ সমস্যার বৃহত্তর দিক আছে অনুভব করে দুজনেই, তার স্বরূপটা কী তাদের ধারণায় আসে না। চিকিৎসকেরা কর্তব্য করে না, ভুল করে, অন্যায় কবে, কিন্তু এটাই যে শেষ কথা নয় তারা বোঝে। আসল কথা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার আয়ত্তে আসে না।

এই আলোচনার মধ্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় গীতা, অনেকটা মায়ার মতো ভঙ্গিতে।

পরিমল উঠে দাঁড়ায়।

নমস্কার। ভালো আছেন ?

নমস্কার। দেখতেই তো পাচ্ছেন ভালো আছি।

পরিমল সস্মিতভাবে একটু হাসে। কেদার বলে, তুমি ভুল করলে গীতা, ওটা দেখার প্রশ্ন নয়। ভালো আছেন মানে আপনাকে দেখে খুশি হয়েছে।

পরিমল নীরবে গীতার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়।

গীতা গম্ভীর মুখে ঘরে ঢোকে। পরিমল বিছানার যেখানে বসেছিল সেইখানে বসে বলে, তুমি খুশি হয়েছ কী ?

তা কী বলে দিতে হবে ?

হবে না ? এত দিনের মধ্যে একবার যেতে পারলে না, খবর পর্যন্ত দিলে না একটা। যেচে এসে হাজির হয়েছি খবর জানতে। খুশি না হওয়া আশ্চর্য নয় তো মোটেই !

ক-দিন বড়ো বিব্রত হয়ে ছিলাম গীতু—একটু করুণ সুরেই কেদার বলে, তুমি না এলে আজ নিশ্চয় যেতাম। ক-দিন যে কীভাবে কেটেছে—

এক মুহূর্তে খুশি আর উৎসাহিত হয়ে গীতা বলে, বিলেত যাবার চেষ্টা নিয়ে তো ? কী হল শেষ পর্যন্ত ? কেন যে তুমি ইতস্তত করছ !

না, ঠিক সে জন্য নয়। কয়েকটা কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তার চেয়ে বিব্রত ছিলাম কতগুলি নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। আজও মনটা ভালো নেই। একটি রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, আজ সে মারা গেল।

সব রোগী কী বাঁচে ? সে জন্য ডাক্তারের বিচলিত হলে চলে না।

ওই রোগী বাঁচত—ডাক্তাররা বাঁচালেন না। ডাক্তার হয়ে এটা সইছে না।

ডাক্তার পালের কথাটা গীতাকে বলা যায় না, তাই কেদার বলে চলে, কেবল এটা নয়, আরও রোগীকে মরতে দেখেছি ডাক্তারের জন্য। আর দেখেছি, ডাক্তার ঠকাচ্ছে রোগীকে, ভয় দেখাচ্ছে, উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছে—

সবাই ?

না না, সবাই নয়। কিন্তু ফিয়ের দু-টাকা চার-টাকা না পেলেও রোগীকে মরতে দেন না এমন ডাক্তার ক-জন আছে ভাবি।

ডাক্তারকেও বাঁচতে হবে।

শুধু ব্যবসা করার জন্যই কী ড'ক্তার হলাম ? ফি বেশি হবে, এই জন্যই কি বিলাত যাব ?

রোগীর মরণে মনমরা কেদারকে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রায় অপদার্থ ভণ্ডের মতো ঘৃণা করে গীতা। তীক্ষ্ণসুরে প্রায় ধমক দিয়ে বলে, কী বলছ তুমি পাগলের মতো ?

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ভাঁজ করে টেনে নিয়ে যায় কপালের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। অবিশ্বাসের বিদ্বেষে তার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি এসে যোগ দেয়, বারো-তেরোবছর বয়স থেকে তুমি না স্বপ্ন দেখে আসছ একদিন মস্ত বড়ো ডাক্তার হবে ? লোকে বলবে কেদার ডাক্তার ম্যাজিক জানে, মরা বাঁচায় ? দুমাস আগেও না তুমি বলতে যত কিছু শিখবার আছে আগে শিখে তবে ডাক্তারি করবে ? আজ আবার উলটো গাইছ কেন ?

উলটো গাইছি না গীতু।

এক-একদিন তোমার মুখে গীতু শুনলে গা জ্বলে যায়।

একটু আহত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কেদার চা শেষ করে সিগারেট ধরায়।

ও রকম মন্তব্যের এ রকম জবাবই গীতা পছন্দ করে বেশি।

বিষাদ ও বিতৃষ্ণার চাপে জোর করে আদায় করা অবসরটুকু কথার ফাঁকিতে ভরে তুলতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না।

এদিক দিয়ে গীতার সঙ্গে তুলনা হয় না। রাগ অভিমান জানিয়ে সহিষ্ণুতা থেকে বা প্রশ্রয় দেবার উদারতা থেকে তার কাছে মুখর জবাব না পাওয়া গীতা মেনে নেয় না, আঘাত তাকে ছুঁয়ে একটু আহত করেছে জানালেই সে সন্তুষ্ট হয়। এটা গড়ে উঠেছে তাদের মেলামেশার শেষের দিকে। যখন থেকে মান অভিমান রাগ ও বিরোধের ছোটোবড়ো সংঘাতগুলি শুধু শূন্য-ভরা বুদ্‌বুদের মতো হওয়ার বদলে জীবনের বাস্তবতাকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হতে শুরু করেছে।

তার নীরবতায় শান্ত হয়ে গীতা বলে, উলটো গাইছ না যদি সত্যি হয়, তোমার কথার মানেটা তবে কী? কী বলতে চাও তুমি?

আমি বলতে চাই বিলাতি ডিগ্রি পেলেই ভালো ডাক্তার হয় না।

তা হয় না। কিন্তু হয়ও তো?

সেটা ডিগ্রি পাবার গুণে নয়। ডাক্তারের নিজের গুণে।

নিজের গুণে ছাড়া ডাক্তার ভালো হবে কী করে? সে তো ধরা কথা। বিদেশে বেশি শেখবার সুযোগ তো পায়, এ দেশে যার ব্যবস্থা নেই। সেই জন্যেই তো বিদেশি ডিগ্রির দাম।

কেদারের মুখে বিষাদের থমথমে গাম্ভীর্য নেমে আসে।

সেই জন্যেই কী? না বেশি পয়সা পাওয়া যায় বলে, লোকের অন্ধ মোহ আছে বলে? হর্ষ কাকারও তো বিলাতি ডিগ্রি, অনেক বেশি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে দেশি ডাক্তারের চেয়ে। কোনো কাজেই তো সে বিদ্যা লাগে না, মোটা ফি আর পসার ছাড়া। নিজের খেয়ালে রোগীকে পর্যন্ত মরতে দেন—মেরেই ফেলেন এক রকম।

এবার গীতা রাগ করে।—মেরে ফেলেন তো কী? তুমি তো হর্ষ ডাক্তার নও! হলে অ্যাদ্দিনে বিলেত যাবার খরচা নিয়ে বিয়ে করে ফেলতে। বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এলে তুমিও তো হর্ষ ডাক্তার হয়ে যাবে না।

সে কথাটাই ভাবছি।

গীতার সঙ্গে এমন একটা কলহ হয়ে যায় কেদারের যে কোনো পক্ষ থেকেই বেশি রকম কড়া কথা একটিও না বলা হলেও ছাড়াছাড়ি হবার পর দুজনেরই মনে হয় তারা যেন আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

রাগারাগি আগেও তাদের হয়ে গেছে অনেকবার, এমন কথাও একজন আরেকজনকে বলেছে তখন যা মনে হয়েছে অমার্জনীয়, ও রকম মন্তব্যের পর এ জীবনে আর তাদের কথাবার্তা হওয়াও সম্ভব নয়।

কিন্তু দুদিনে মিটে গেছে সে বিবাদ, মনেও থাকেনি কী নিয়ে তাদের ঝগড়া বেধেছিল।

এতটুকু তিক্ততার জের টেনে তাদের চলতে হয়নি। আঘাত যে করেছে সে হয়তো কোনো চেষ্টাই করেনি মিটমাটের, একটা মিষ্টি কথা বলে মিলিয়ে দিতে চায়নি রূঢ় কথার স্মৃতি।

আহত হয়ে যার রাগ করার কথা সেই হয় তো গিয়ে বলেছে, রাগ করনি তো?

এবার যেন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে থাকে তাদের মনান্তরের পরের দিনগুলি, রাগ অভিমানের জ্বালা কমবার বদলে বাড়তে থাকে!

আগের কলহগুলি তাদের হত সামান্য ব্যাপার নিয়ে, যত তীব্র হোক মনান্তর, জীবনের কোনো গভীর স্তরকে ভিত্তি করে বাড়তে না পেরে অবিলম্বে শূন্যে মিলিয়ে যেত। সে সব ছিল যেন নিছক দুটি বন্ধুর রাগারাগির খেলা। অথবা যদিও তাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন ধরে এবং বিয়েটা হয়েও হয়নি আজ পর্যন্ত, তবু ঝগড়াঝাঁটিটা এ পর্যন্ত যেন তাদের হয়েছে দাম্পত্য কলহের মতোই!

এবার টান পড়েছে মর্মে, তাই বাইরে গুরুতর রূপ না নিলেও সংঘাতটা ভিতরে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এ তো রাগারাগি নয়, খেয়ালের সংঘাত নয় যে রাগ কমলে আর খেয়াল উপে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসাবনিকাশ বোঝাপড়ার ভিত্তে চিড় ধরেছে তাদের অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সংযত আলোচনায়। আজ বোধ হয় এই প্রথম বাস্তব মূল্য বিচার হয়ে গেছে তাদের অনেকদিনের সহজ সাধারণ মেলামেশায় গড়ে-ওঠা ভালোবাসার।

বেশি কথা তাদের বলতে হয়নি। ভূমিকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাদের নেই। গীতা যা বলেছে তাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে কেদারের ভালোবাসায় তার সন্দেহ জেগেছে।

মৌখিক কোনো কনট্র্যাক্ট না করে থাকলেও এ বোঝাপড়া তাদের মধ্যে হয়েছিল যে কেদার বিলাত গিয়ে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলে তাদের বিয়ে হবে। বিলাত যাবার আগেও বিয়েটা অনায়াসে হয়ে যেতে পারত।

এ দেশে পাস করে কেদার বিলাত থেকে ডিগ্রি আনতে যেতে রাজি আছে এটুকু জানালেই ডাক্তার পাল যে বিয়েতেও মত দিত, বিলাতি ডিগ্রি আনবার খরচ দিতেও রাজি হত তাতে গীতার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রিয়ার সাথে মিলনের ও জীবনে উন্নতিলাভের এই সহজ সাধারণ পথটা গ্রহণ করতে কেদার রাজি হয়নি। ডাঃ পালের কাছ থেকে এ রকম কোনো প্রস্তাব যে এসেছে, বা গীতা যে তাকে এ রকম কোনো পরামর্শ দিয়েছে এবং সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে তা নয়। এ জানাটা মনে মনে গড়ে উঠেছে আপনা থেকে।

এই সহজ উপায়টা কেদার না নেওয়ায় গীতাও খুশি হয়েছে।

তার জন্য বা বড়ো হবার জন্যও কেদার নিজেকে সস্তা করতে চায় না এ যেন তারই গৌরব, তারই কৃতিত্ব। তার এই মনোভাব থেকে কেদারও নিজের মধ্যে জোব পেয়েছে।

কিন্তু আজ গীতা স্পষ্টই বলে গেছে যে তার বাপের পয়সায় বড়ো হতে না চাক, সেই অজুহাতে বড়ো হবাব সাধটাও যে কেদার বর্জন করবে, নিজে ও জন্য চেষ্টা করবে না, এটা বরদাস্ত করবে না গীতা।

অন্য কিছুর জন্য হোক বা না হোক, তাব জন্যই কেদারকে বড়ো ডাক্তার হতে হবে, দেশ-জোড়া নাম-ডাক পসার অর্জন করতে হবে।

টাকার প্রশ্নও অবশ্য আছে এর মধ্যে, কিন্তু টাকাটা গীতার কাছে তুচ্ছ না হলেও বড়ো কথা নয়, বেশি টাকা রোজগার না করেও যদি কেদার বড়ো ডাক্তার হতে পারে গীতার তাতে কোনো আপত্তি নেই !

তোমার যেন উৎসাহ দেখছি না কোনো বিষয়ে।

কোনো বিষয়ে বলতে গীতা কোন বিষয়টা বোঝাতে চেয়েছিল বুঝতে দেরি হয়নি কেদারের। দেরি হওয়ার কথাও নয়। এগারো দিনের মধ্যে একবার সে চোখের দেখা দেখতে যায়নি এই নালিশ দিয়ে কথা আরম্ভ করেছিল গীতা, প্রশ্ন করেছিল, আমায় দেখে তুমি খুশি হয়েছ কী ? নানাকথার মধ্যে তারপর এই অভিযোগটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিশ্রীভাবে।

অসন্তোষের সূচনা শুধু গীতার মধ্যেই দেখা দেয়নি।

এবার সে কী করবে সুনিশ্চিতভাবে ঠিক না করায়, ঠিক করাব জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শ না চালিয়ে যাওয়ায়, বাড়ির লোকের মধ্যেও অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছে, ক্ষীণ অস্পষ্ট এবং মৃদু হলেও অনুযোগ আসছে নানাভাবে।

প্রমথ কয়েকবার বলেছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে : তুমি কী ভাবছ বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক, এবার তো মনস্থির করে ফেলতে হয় !

অন্যেরা কথাটা তোলেন অন্যভাবে।

এবার বিয়ে করতেই হবে তাকে।

তার মনস্থির করার প্রশ্নটা মোটামুটি দাঁড়িয়েছে এই। ডিসপেনসারি করে দিয়ে তাকে ডাক্তারিতে বসাবার ক্ষমতা প্রমথের নেই।

অনেকদিন আগে থেকেই এদিক ওদিক খোঁজখবর নেওয়া এবং আলাপ-আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি একটি মেয়ের খবর পাওয়া গেছে, বাপের সে একমাত্র মেয়ে, ভালোরকম ডিসপেনসারি দেবার জন্য বাপ মোটা টাকা দিতে প্রস্তুত।

তবে, একটা কথা এই যে মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়। একেবারে চলনসই সাধারণ মেয়ে।

বাড়ি থেকে তাই কেদারের ওপর বেশি চাপ দেবার ভরসা কারও হচ্ছে না। মেয়েটিকে একবার দেখে আসবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আর ভাসা ভাসা উপদেশ শোনানো হচ্ছে যে সাধারণ বাঙালি সংসারে মোটামুটি সাধারণ মেয়েই ভালো। জীবনে উন্নতি করাটাই বড়ো কথা। উন্নতির জন্য স্থায়ীভাবে গুছিয়ে বসবার এমন সুযোগও মানুষের হঠাৎ মেলে না।

কেদার জানে, মেয়েটি দেখতে শুনতে মোটামুটি একটু ভালো হলে ইতিমধ্যে তার ওপর জোর জবরদস্তি শুরু হয়ে যেত।

ডাঃ পালের মেয়েটাকে যখন খুশি বিয়ে করে সে বিলাত যেতে পারে কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলেও ডাঃ পালের কাছে সে টাকা নিতে রাজি নয়—এ খবরটা জানলে বাড়ির লোক কী করত কে জানে।

বড়ো সস্তা মনে হয় নিজেকে কেদারের।

সংসার তার দাম কষে দিয়েছে। তার একমাত্র ক্রেতা মেয়ের বাপেরা, তারা ছাড়া একটা ওষুধের দোকান খোলবার টাকা তাকে দিতে কেউ রাজি নয়। ডিসপেনসারি দিয়ে বসতে হোক, বিলাত গিয়ে নিজের দাম বাড়াতে হোক, কোনো মেয়ের বাপের শরণ নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথও তার সামনে খোলা নেই। নিজের বাজারদর বাড়াবার জন্যে আরও সময় ও শক্তি নষ্ট করতে তার দ্বিধা দেখে গীতার মনে পর্যন্ত আপশোশ জেগেছে, বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এসে তার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনে তার উৎসাহের অভাব জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে গীতার মধ্যে। তাদেব এতদিনেব সহজ সুন্দর প্রেম সমস্যা হয়ে উঠেছে গীতার কাছে।

এখন তার যে দাম গীতা তাতে সন্তুষ্ট নয়।

পাড়ার ত্রৈলোক্য মজুমদার ধনী ব্যবসায়ী, স্বদেশি বলেও নাম আছে। কয়েক রকম ব্যাবসা তাব আছে, তার মধ্যে জীবনবীমা কোম্পানি ও কটন মিল প্রধান। জাতীয় শিল্পের উন্নতির দ্বারা স্বদেশ সেবার ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার প্রচুর পুরস্কার সে পেয়েছে, যা ধরেছে এবং ধরছে তাই সোনা হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে।

কেদার একদিন সকালে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে, ত্রৈলোক্যের মোটরগাড়িও প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরবার পথে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ত্রৈলোক্য মুখ বার করে ডাকে, ওহে কেদার, শোনো শোনো। তোমাকেই খুঁজছিলাম যে!

আমাকে?

তোমাকে। এসো, গাড়িতে এসো।

সেখান থেকে হেঁটে ত্রৈলোক্যের বাড়ি তিন মিনিটের পথ। কেদার বলে, আপনি এগোন, এই মোচাটা বাড়িতে দিয়েই আমি আসছি।

ত্রৈলোক্য বলে, আরে এসো। মোচা তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার লোক আছে আমার। চলে এসো।

হঠাৎ ত্রৈলোক্য মজুমদারের এই গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায় কেদার কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। সে আর কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসে।

ত্রৈলোক্য অনুযোগ দিয়ে বলে, ভালোভাবে পাস-টাস করেছ শুনলাম ? বেশ বেশ। সুসংবাদটা জানানো তো উচিত ছিল একবার !

পুরানো সুসংবাদটা এতদিনে ত্রৈলোক্যের কানে গিয়েছে এতে কতখানি কৃতার্থ হবে কেদার ভেবে পায় না। বাড়ি বয়ে গিয়ে সুসংবাদটা তাকে জানিয়ে আসবার দায়িত্বও কী হিসাবে তার ঘাড়ে চাপে সে বুঝে উঠতে পারে না।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে কেদারকে ত্রৈলোক্য আবও খাতির করে। নিজের বসবাব ঘরে আদর করে বসিয়ে চা ও খাবার আনতে হুকুম দেয়। আর কথা যা বলে তাতে কেদারের ভালোমন্দ সম্পর্কে তার বেশ খানিকটা আগ্রহ প্রকাশ পায়।

মতলব একটা আছে ত্রৈলোক্যের বুঝতে দেরি হয় না কেদারের। কিন্তু তার কাছে ত্রৈলোক্যের মতো লোকের কী দরকার থাকতে পারে সেটাই সে বুঝে উঠতে পারে না।

বোঁচা-খাঁদা মেয়েও নেই ত্রৈলোক্যের যে তাকে ঘর-জামাই করার ইচ্ছা জাগবে !

হর্ষের ওখানেই বসছ, না ? ওখানেই থাকবে নাকি ?

না। কিছুদিনের জন্য আছি।

তারপর কী করবে ভাবছ ? চাকরি নেবে না প্র্যাকটিস করবে ?

ঠিক করিনি কিছু এখনও।

তা বটে। তা বটে। হঠাৎ কিছু ঠিক কবা কঠিন বটে এখন। যা স্থির করবে, সমস্ত ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে তার উপর। কত দ্বিধা, কত ভয-ভাবনা আসে এ সময়টা ! আমি জানি, আমারও এমন অবস্থা এসেছিল এক সময় !

এতক্ষণ কেদারের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলায় ছলনা চালবার পর এবার প্রথম নিজের কথা আরম্ভ করার সময় মুখের ভাবটা বদলে যায় ত্রৈলোক্যের,—চাকরি করব, না, ব্যাবসায় নামব যখন স্থির করতে হয়েছিল। আজও মনে আছে সে দিনগুলির কথা। চাকরিতে আর কিছু না হোক মাস গেলে মাইনেটা বাঁধা। ব্যাবসায়ে যদি সুবিধা না হয় ! উঠতে না পেরে যদি তলিয়ে যাই ! মনটা কীসে ঠিক করেছিলাম জানো কেদার ? দেশের কথা ভেবে। ভাবলাম, একমাত্র শিল্পের উন্নতিতেই যখন দেশের উন্নতি, রিস্ক থাকলেও এদিকেই নেমে পড়ি। তা, ভুল করিনি, কি বলো, অ্যাঁ ?

নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই গভীর সন্তোষের হাসি হাসে।

তাকে মহাপুরুষ বলে মানতে আগে কেদারের সংশয় থাকলেও এখন যে তাব সব সংশয় মিটে গেছে তাতে যেন আব তার সন্দেহ থাকে না, এখন থেকে কেদার তার ভক্ত হয়ে থাকবে নিশ্চয় !

কেদার চুপ করে থাকে।

কিন্তু ত্রৈলোক্য নিজেব ভাবেই মশগুল ! সে বলে চলে, দিবারাত্রি খাটতে হয়েছে, দাঁত কামড়ে লেগে থাকতে হয়েছে। লোকে ভাবে, দেশের নামে কিছু করলে বুঝি সেটা সহজে হয়। তাই যদি হত, তবে সবাই কী আর করত না ? আমার কাছে এসে চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করত ? শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। সত্যি বলছি তোমায়, শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না—নিষ্ঠা চাই, পরিশ্রম চাই, ইনিসিয়েটিভ চাই, জীবনে উন্নতি করা কী মুখের কথা—টাকা করা ?

কেদার ভাবে এত কথার পর তাহলে জীবনে উন্নতি করা এসে দাঁড়াল টাকা করায় !

কী আর বলা যায় ! টাকার জন্য নিজের দেশকে বিদেশের কাছে বিক্রিও তো করেছে মানুষ। এ ভদ্রলোক তাদেরই শিষ্য !

কেদার চুপ করে থাকে।

আমি বলছিলাম কী জানো, একটা পেটেন্ট ওষুধের কারবার শুরু করব ভাবছি।

কিছু আজেবাজে কথার পর আচমকা কাজের কথা আরম্ভ করার স্বভাবগত অভ্যাস বজায় রেখে ত্রৈলোক্য বলে, কিছুদিন থেকে চিন্তা করছিলাম এ বিষয়ে। এই এক ব্যাবসা যা শুধু বিজ্ঞাপনের জোরে চলে, আর সহজে অল্প টাকাতে হয়। সাধারণ কয়েকটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ বানিয়ে শিশিতে ভরে বেশ জমকালো লেবেল-টেবেল দিয়ে বাজারে ছাড়লেই হল। গোড়ায় খুব ফলাও করে বিজ্ঞাপন দরকার—একবার দাঁড়িয়ে গেলে সে খরচও কমিয়ে দেওযা যায। অ্যালোপ্যাথি আর কবরেজি এই দুটো ডিপার্টমেন্ট যদি খোলা যায় একটা কোম্পানি দাঁড় করিয়ে, আর যদি অ্যালো-কবরেজি নতুন ধরনের ওষুধ ছাড়া যায় বাজাবে—

ত্রৈলোক্য বলে যায়, কেদার শোনে।

দেশে ডাক্তাব অল্প, হাসপাতাল ডাক্তারখানা অল্প। চিকিৎসার ব্যবস্থা যেটুকু আছে দেশে, খরচ দিয়ে সেটা কাজে লাগাবার পয়সা নেই বেশির ভাগ লোকের।

অথচ দেশটা রোগ-ব্যারামে ভরা !

তার ওপর লোকগুলি অশিক্ষিত, মনগুলি কুসংস্কারে পরিপূর্ণ।

পেটেন্ট ওষুধের ব্যাবসা চালাবার এমন ফিল্ড আর কোনো দেশে নেই। ঘরে বসে চকখড়ির গুঁড়োতে একটু নিমের আরক মিশিয়ে কাগজের প্যাকেটে ভরে গালভবা নাম দিয়ে ফিরি কবে কতলোক দিব্যি পয়সা রোজগার করছে !

পেটেন্ট ওষুধের বড়ো কারবার যত আছে তার চেয়ে বোধ হয ঢের বেশি ক্যাপিট্যাল খাটছে দু-শো পাঁচশো হাজার টাকার ছোটো ছোটো অসংখ্য কারবারে। বড়ো কোম্পানিগুলি দামি ওষুধপত্র নিয়েই থাকে, ছোটোগুলির সঙ্গে তাই কম্পিটিশন নেই। কোনো বড়ো কোম্পানি যদি বড়ো স্কেলে এক সঙ্গে দুরকম ওষুধপত্রের কারবার চালায়, দেশজোড়া ছোটো ছোটো কারবারগুলি উৎখাত কবে অনায়াসে সে ফিল্ডও দখল করতে পারে। বড়ো স্কেলে ছোটো কারবারিদের টেকনিক ফলো কবলেই হল।

ত্রৈলোক্য তাই ভাবছে, লাখ তিনেক টাকা খবচ করে একটা কারবার ফাঁদবে।

কেদার আর মুখ না খুলে পারে না, বলে, কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবু, ভালো ওষুধ না দিলে—

ভালো ওষুধ দেব বইকী। সবাই যা কিনেছে তার চেয়ে ভালো ওষুধ না দিয়ে কী আব খাবাপ কিছু বাজারে ছাড়ব ? তবে কী জানো—

ত্রৈলোক্য কয়েক মুহূর্ত বক্তব্যটা মনে মনে আউড়ে নেয়। এ সব বোকার কাছে সাবধানে কথা বলা দরকার। বলে, অন্ধকে আলো দান করা পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কাজ বিলাতি ওষুধের মতো দামি ওষুধ কেনবার কি ক্ষমতা আছে এ দেশের লোকের ? আমি কী ভাবিনি ওদিকটা, দেশেব জন্য এত করছি, এত ভাবছি ! যা হবার নয সে স্বপ্ন দেখে লাভ কী ? যখন সেদিন আসবে, খাঁটি স্বাধীনতা আমরা পাব,—ত্রৈলোক্যের চোখে মুখে যেন স্বপ্নের গরিমা নেমে আসে,—লোকের যখন ক্ষমতা হবে যেমন রোগ তার উপযুক্ত ওষুধ কিনবার, চিকিৎসা করাবার, তখন কী আর সাধারণ চলনসই ওষুধ বাজারে ছাড়ব, না তার দরকার হবে, না লোকে তা কিনবে ?

কেদার মনে মনে বলে, লোকে কিনবে না সেটাই হবে আসল কথা !

ত্রৈলোক্য বলে যায়, যে ওষুধ দেব, কিছু তো উপকার হবে তাতে ? চার পয়সা দামের মাজন দিয়ে যে কাজ চালায় তাকে আট আনা এক টাকা দামের ভালো পাউডার বা পেস্ট দিতে চেয়ে লাভ কী ? সে কিনবে না, কিনতে পারবে না। সস্তা মাজন ভালো নয় বলে তৈরি বন্ধ করলে, সে দাঁতই মাজবে না। চকখড়ি আর দু-চারফোঁটা নিমের আরকের একটু তো উপকার আছে ? তা থেকেও বেচারি বঞ্চিত হবে। ম্যালেরিয়ার কথা ধরো। ভালো কুইনিন, জোলাপের ওষুধ, পিলের ওষুধ এ সব পুরো পরিমাণে দিয়ে ওষুধ বেচতে গেলে দাম পড়ে যাবে কত ! ক-জন কিনতে পারবে ? তার চেয়ে দু-গ্রেন কুইনিনও যদি পেটে পড়ে সেটা কি ভালো নয় ?

কেদার মনে মনে বলে, কী যুক্তি !

বলে—ভাবে যে মনে মনেই শুধু মন্তব্য করছে কেন, মুখ খুলে তর্ক জুড়তে পারছে না কেন ? ত্রৈলোক্যকে চটাতে সাহস হচ্ছে না ? পেটেন্ট ওষুধের কারবার খোলা সম্পর্কে তাকে ডাকবার কারণটা জানবার কৌতূহল তার আছে বটে কিন্তু ত্রৈলোক্যের কাছে কোনো উপকার লাভের লোভ তো তার একফোঁটা নেই ! তবু যেন ত্রৈলোক্যেব কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বেধে যাচ্ছে।

যাক গে, ও সব পরের কথা, পরে হবে।

ত্রৈলোক্য এবার আসল কাজের কথায় আসে।

তোমায় কেন ডেকেছি বলি। চাকরির দিকে যেয়ো না, তোমার তা দরকার হবে না। আমার এই কারবারে তোমায় নিয়ে নেব ভাবছি। চাকরি তোমাকে করতে হবে না, কিছু শেয়ার তোমায় দিয়ে দেব। আর যদ্দিন না তোমার শেয়ার থেকেই যথেষ্ট টাকা পাও তোমায় কিছু কিছু হাত-খরচা দেব। এদিকে তুমি স্বাধীনভাবে নিজের প্র্যাকটিসও গড়ে তুলতে পারবে।

আমার কাজ কী হবে ?

তোমার কাজ ? তোমার খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ হবে। কারবারের মূল ব্যাপারে থাকবে তুমি। সে জন্যেই তো মাইনের ব্যবস্থা না করে তোমায় কারবারের মধ্যে টেনে নিচ্ছি। কী কী পেটেন্ট ওষুধ বেশ চলবে, আমিই তা বলে দেব। তুমি লাগসই প্রেসক্রিপশন তৈরি করে দেবে। সহজে সস্তায় ওষুধটা হয়, অথচ—

এতক্ষণ প্রতিবাদ না করার দুর্বলতায় নিজের ওপর কেদার বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এবার সে ত্রৈলোক্যকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে, আমি ওর মধ্যে নেই। আমায় মাপ করবেন।

কেন ?

ত্রৈলোক্য একেবারে আশ্চর্য হয়ে যায়। সদ্য পাস করা একজন যুবক যে তার সঙ্গে কারবারে নামবার সুযোগ পাওয়ার সৌভাগ্যে গদগদ হয়ে পড়ার বদলে সোজাসুজি তার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, ত্রৈলোক্যের যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

কেদার বলে সহজভাবে, ও সব জুয়াচুরির মধ্যে আমি নেই।

জুয়াচুরি ? এবার নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না ত্রৈলোক্যের। মুখটা তার হাঁড়ি হয়ে যায়।

জুয়াচুরি কী বলছ হে ?

স্রেফ জুয়াচুরি। আপনার কথামতো যেমন এত বেশি রোগ আর চিকিৎসার অভাব কোনো দেশে নেই, তেমনি বোধ হয় পেটেন্ট ওষুধের এমন জুয়াচুরির ব্যাবসাও কোনো দেশে এত বেশি চলে না—এমন খোলাখুলিভাবে। বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে মানুষ মেরে আপনি টাকা রোজগার করতে চান, এটা জুয়াচুরি নয় ? আপনাদের মতো যারা এ কাজ চালাচ্ছে ধরে ধরে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত !

এত কড়া করে এত কথা সে বলতে চায়নি ! ডাক্তারদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভটা ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল, রোগীদের ঠকাবার দেশ-জোড়া এই ভয়াবহ অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তার জ্বালা কম ছিল না। বলতে গিয়ে সামলাতে পারল না।

তারপর অবশ্য ত্রৈলোক্য ভদ্রভাবে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। ভদ্রভাবে এই জন্য যে এ সব মাথা-পাগলা যুবককে খেপাতে তার ভয় করে—কী করে বসে তার ঠিক কী !

৯

জ্যোতি হাসি ফুটিয়েছিল সকলের মুখে। আবার সেই মুখগুলিতে অন্ধকার নেমে আসে।

জ্যোতি সত্যই যেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছিল যে স্বাস্থ্যের বিকাশে, সুখস্বপ্নের মতোই যেন তার সেই স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি উপে যেতে আরম্ভ করে।

কে জানে কী হল জ্যোতির !

বাড়ির লোকের কী হয়েছে বোঝা যায়।

ডাক্তারের চোখ নিয়ে আর জ্যোতির অবস্থা অনুমান করার প্রয়োজন হয় না। তার দিকে তাকালেই সেটা টের পাওয়া যায়।

মেয়েদের কানাকানি একেবারে অভিযোগ হয়ে পৌঁছায় জনার্দনের কাছে, এ কী বউ আনা হল তাদের শুদ্ধ পবিত্র বংশে !

জনার্দন গর্জন করে ওঠে।

পরিমল বলে, আপনি অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আমাদের বংশ পবিত্রই আছে।

সকলের মুখ কালো হয়ে থাকলেও সেটা বিশেষ দুর্ভাবনার কারণ হত না। পরিমল যখন তাব পক্ষে আছে, কবিরাজিতে তার পসার ও আয় অল্পে অল্পে বাড়ছে, মুখের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সকলের কেটে যাবেই। কিন্তু জ্যোতির স্বাস্থ্য হানিই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা।

পসার ও উপার্জন সামান্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে উগ্র হয়ে উঠেছে নিজের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর পরিমলের অন্ধ বিশ্বাস এবং কেদারদ্রের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে বিদ্বেষ। সে যেন আজ ভুলে গেছে ডাক্তারি শিখতে না পারার জন্য তার আপশোশ ও আত্মগ্লানি, কবিরাজ হতে হয়েছে বলে সকলের কাছে লজ্জা বোধ করা !

হয়তো তার আজকের মনোভাবটা তারই প্রতিক্রিয়া !

কেদার বলে, জ্যোতিকে একটু ভালোভাবে পরীক্ষা করানো দরকার।

পরিমল বলে, পরীক্ষা করেছি।

কেদার বলে, এখন থেকেই ভালোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত কিন্তু।

পরিমল বলে, চিকিৎসা করছি বইকী।

কেদার বলে, কী জান ভাই, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা নিজে না করাই ভালো।

পরিমল বলে, নিজে কেন করব ? পূর্ণেন্দু সেনকে দেখিয়েছি, তাব ব্যবস্থামতো ওষুধপত্র দিচ্ছি।

কেদার তবু হাল ছাড়তে চায় না। আবার বলে, এখন হর্ষকাকার কাছে গিয়ে থাক না ? প্রথমবার এ সময়টা বাপের বাড়ি গিয়ে থাকাই ভালো।

পরিমল আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তা কী আমি বুঝি না ? কিন্তু সাহস পাচ্ছি না ভাই। ওখানে পাঠালেই ওর বাবা এ চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করবেন। আমি ভরসা করতে পাচ্ছি না।

কেদার নির্বাক হয়ে থাকে।

জ্যোতিকে সে বলে, তোর না এত বুদ্ধি, এত জোর ? বাবার কাছে গিয়ে থাকার ব্যবস্থাটুকুও করতে পারছিস না ?

জ্যোতি শীর্ণমুখে হেসে বলে, কী হবে গিয়ে ?

চিকিৎসা হবে। বাঁচবি।

ইস্ ! তোমাদের চিকিৎসাতেই যদি মানুষ বাঁচত তবে আর ভাবনা ছিল না।

হর্ষকাকার চিকিৎসাতে বিশ্বাস করিস না তুই ?

বাবার কথা আলাদা। বাবা তো আর নিজে চিকিৎসা করবে না।

মেয়েকে দেখতে এলে একদিন জামাইয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যায় হর্ষ ডাক্তারের।

পরিমল অবশ্য হর্ষের সম্মান রক্ষা করেই ঝগড়া করে, হর্ষ খুব বেশিরকম চটে গেলে অগত্যা তাকে চুপ করে যেতে হয় ! শ্বশুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করাটাও তার পেশা ও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শের খাতিরে মানতে হয়েছে !

শেষে হর্ষ বলে, আমি আর সাতদিন দেখব। আরও যদি খারাপ হয় জ্যোতির শরীর, জোর করে আমি ওকে নিয়ে যাব বলে গেলাম।

পরিমল বলে, জোরের দরকার কী ? আমি তো বেঁধে রাখিনি আপনার মেয়েকে। আপনার মেয়ের ইচ্ছা হলে এখুনি সে যাক না আপনার সঙ্গে।

কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক পরিমল, দিন দিন তার মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া ঘন হতে থাকে।

মাঝখানে একটু উন্নতি হয় জ্যোতির চেহারার।

পরিমল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

কিন্তু মাসখানেক পরেই আবার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে যায় জ্যোতির স্বাস্থ্য।

কয়েকটা বিশেষ উপসর্গ দেখা দেয় তার, যা ডাক্তার কবিরাজ কেন মেয়েদের কাছেও অত্যন্ত চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে।

কেদার কথা বন্ধ করে দেয় পরিমলের সঙ্গে। দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কিন্তু সেটা বজায় রেখে চলা সম্ভব হয় না জ্যোতির জন্য।

জ্যোতি এসে বলে, তুমি চিরদিন ঠিক উলটো বুঝে এলে কেদারদা। এতদিন আমাকে বাপের কাছে পাঠাবার জন্য ধস্তাধস্তি কবলে, আর মানুষটা যখন নিজেই ভড়কে গিয়ে পাঠিয়ে দেবার কথা ভাবছে তখন রইলে চুপ করে ! এত কাণ্ড করার পর ও নিজে এখন আমাকে পাঠায় কী করে ?

তাই নাকি ? হর্ষকাকাকে বলব নেওয়াবার ব্যবস্থা করতে ?

জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমি বললাম ওর কথা। পাঠাতে চায় না বলে তুমি রাগ করেছ, তোমার ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে চাই। ওর দোষ নেই—আমিই রাজি নই বাবার কাছে যেতে।

ও ! বুঝেছি এবার। পরিমলের বদলে তোর ওপর রাগ করতে বলছিস তো ?

তাই করো !

স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে আরও স্পষ্ট হয়েছে তার বিবর্ণ মুখে উগ্র একগুঁয়েমির ভাব।

নিজের প্রেমকে সার্থক করার পর আজ যেন তার দরকার পড়েছে আরও বেশি প্রাণান্তকর চেষ্টায় বাজি জিতবার পর সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবার অনিবার্য প্রক্রিয়া ঠেকানো।

পরিমল তার কবিরাজি ওষুধটি যথানিয়মে বাজারে ছেড়েছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কিন্তু তার আশা সফল হয়নি। নিত্য নতুন এ রকম কত ওষুধ বেরিয়ে বাজার একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, তার মধ্যে নতুন একটা ওষুধকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নয়।

আসল কথা বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের বিরাট ব্যাপক অভিযান এবং সেটা টেনে চলা।

তাতে অনেক টাকা দরকার।

অত টাকা পরিমল কোথায় পাবে ?

কেদার তাকে এদিকটা খেয়াল রাখতে বলেছিল। কিন্তু পরিমল গ্রাহ্য করেনি।

তার ওষুধের নাকি অসাধারণ গুণ। যে কোনো পেটের অসুখ এ ওষুধ খেলে তিন দিনে সেবে যাবে—কলেরায় পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার সঙ্গে এ ওষুধ খাওয়াবাব ব্যবস্থা করলে রোগী নিশ্চয় সেরে যাবে।

গুণের কদর হবে না জগতে ?

কিন্তু জ্যোতির মার গয়না বিক্রিব টাকা শেষ হয়ে গেছে, আর বিজ্ঞাপন দেবার সাধ্য পরিমলের নেই—মানুষ যে গুণের কদর জানে তার প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি। তিন মাসে ওষুধ বিক্রি হয়েছে মোটে সাতান্ন প্যাকেট।

এতে অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু ছিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওষুধটা বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে এটাই তো শুভ লক্ষণ। প্রতিমাসে আট-দশ প্যাকেট বিক্রি বেড়েছে।

বিজ্ঞাপনটা চালিয়ে যেতে পারলে বাড়তে বাড়তে একদিন ওষুধটা যে মাসে সাতান্ন শো ফাইল বিক্রি হবে না এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু বিজ্ঞাপন চালাবে কে ?

কেদার তখন জ্যোতিকে সাবধান করে দিয়ে বলে, এ রকম অস্থিবতা তো মারাত্মক ? পরিমল বাস্তব হিসাব করছে না, তাড়াতাড়ি দাঁও মারবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এ ভাবে কেউ কিছু করতে পারে ? ধীরে ধীরে উঠতে হবে পরিমলকে, আর কোনো পথ নেই।

জ্যোতি ক্লান্তকণ্ঠে বলে, সেটা বুঝিয়ে দাও।

আগে তো এ রকম ছিল না পরিমল ?

আমি বিগড়ে দিয়েছি বলতে চাও তো ?

জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে।

কেদার মাঝে মাঝে তাকে বলে, ও বাড়িতে গিয়ে তো থাকতে পাবিস এখন ?

জ্যোতি বলে, না আমি বেশ আছি।

ডিসপেনসারি থেকে বেলা এগারোটার সময় সেদিন কেদার বাড়ি ফিরেছে, মায়া এসে বলে, আজ বউদিকে বিছানা নিতে হল। ক-দিন থেকে বলছি সবাই—

হয়েছে কী ?

মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বর।

বেশি জ্বর ?

মন্দ নয়। দেখে আসুন না একবার ?

কেদার ভাবতে ভাবতে উপরে যায়।

পরিমল বাড়ি ছিল না। জ্যোতি চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে ছিল, মায়ার ডাকে চোখ মেলে কেদারকে দেখে আজও সে একটু হাসবার চেষ্টা করে।

মোহিনী এসে বলে, তুমি একবার পরীক্ষা করে দ্যাখো না কেদার ?

জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করে কী হবে ? আমি ডাক্তারিতে বিশ্বাস করি না।

কেদার বলে, বিশ্বাস নাই বা করলি। আমি শুধু পরীক্ষা করব।

কী দরকার ? মিছে শুধু জ্বালাতন করা।

পরীক্ষা না করেই কেদারকে নীচে নামতে হয়।

ঘণ্টাখানেক পরে পরিমল বাড়ি ফেরে। জামা না ছেড়েই উপর থেকে সে নেমে আসে।

জ্যোতিকে একবার দেখবে কেদার ?

আমায় দেখতে দেবে না।

এবার দেবে। আমি বুঝিয়ে বলেছি।

কেদার ঘরে যেতে জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে, করো। কিন্তু কোনো লাভ হবে না কেদারদা। আমি তোমার ওষুধ খাব না। কবিরাজি ছাড়া কোনো চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস নেই, আমার শুধু কবিবাজি চিকিৎসা হবে। আগেই বলে রাখলাম-কিন্তু।

পরিমল বলে, তোমার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

কী করব ? ডাক্তারি ওষুধ খেয়ে মরব নাকি ?

কেদার ও পরিমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। দুজনেরই একসঙ্গে মনে হয়, নিজের প্রেমের জন্য গায়ের জোবে খাড়া করা নিজের মিথ্যা বিশ্বাসকেও জ্যোতি জীবন পণ কবে আঁকড়ে থাকবে।

কেদার সময় নিয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জ্যোতির দেহযন্ত্রটি পরীক্ষা করে। ধীরে ধীরে এবং তন্নতন্ন করে। তার এই বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা পরিমলের পছন্দ করছে না, এটা সে স্পষ্টই বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করে—জ্যোতিকে নয়, পরিমলকে। পরিমল স্রষ্টা বলেই তার কাছে সে জানতে চায় কোনোদিন তার কোনো বিশেষ রোগ হয়েছিল কি না, যা এই স্বাভাবিক সাধারণ সৃষ্টিকার্যেও মানুষের বহুকষ্টে আয়ত্ত করা সভ্যতাকে বিকৃত কবে দিতে চাইছে।

পরিমল চটে গিয়ে কথা কয় না।

অগত্যা কেদার নতুন জীবনের স্রষ্টার কাছে সাহায্য পাবার আশা ছেড়ে জ্যোতির দেহযন্ত্রটিব মধ্যে ভবিষ্যৎ মানুষের অসম্পূর্ণ দেহযন্ত্রটির সাড়া শোনে।

বড়োই ক্ষীণ মনে হয় সাড়াটা।

সেটা আর আশ্চর্য কী ?

মা হবার সম্ভাবনা ঘটায় কোথায় মা হবাব জন্য প্রস্তুত হবে জ্যোতি—তার বদলে তাকে চালাতে হল মা হবার ছাড়পত্রের জন্য লড়াই।

কোথায় নির্ভয় নিশ্চিন্ত আরামে বিলাসে থাকবে, তাব বদলে ববণ করতে হল ঝড়ঝাপটা।

আগামী মানুষের অবস্থানে গলদ আছে কি না সে ভালোভাবে পরীক্ষা করে।

জ্যোতি বলে, কী করছ কেদারদা ?

তুই চুপ কর !

পবীক্ষা শেষ করে মনের জোরে মুখে হাসি ফুটিয়ে কেদাব বলে, তোর কবরেজি চিকিৎসাই হবে জ্যোতি। আমি শুধু তোর একটা ফটো নেব। অদৃশ্য আলোর ফটো—ডাক্তার ছাড়া কেউ দেখতেও পাবে না, দেখলেও বুঝতে পারবে না কার ফটো কীসের ফটো।

জ্যোতির মুখে হাসি ফোটে।

গেঁযো মেয়ে পেয়েছ, না ? আমি ডাক্তারের মেয়ে ভুলে গেছ ? এক্স-রে করতে চাও কোরো—ব্যবস্থা দিলে আমি কিন্তু মানব না বলে দিচ্ছি।

একটু থেমে বলে, তোমার যেন বেশ হাসিখুশি ভাব কেদারদা ? ঠকাচ্ছ নাকি ?

কেদার বলে, একদিন খুব ভোরবেলা বিপদে পড়ে এসেছিলি মনে আছে ? ডাক্তারি ওষুধ দিয়েছিলাম, ঢকঢক করে খেয়েছিলি ? তেমনই বিপদ যদি হয়, কেবল তোর নয়, পরিমলেরও যদি বিপদ হয়, ডাক্তারি ওষুধ দিলে খাবি না ?

না।

বেশ। কেন জিজ্ঞাসা করলাম জানিস জ্যোতি ? এটা আমরা মেনে নিয়েছি, তোর অনিচ্ছায় তোর চিকিৎসা করা যাবে না। ডাক্তার কবিরাজ দুজনে আমরা তোর কাছে হার মানছি। তুই যা বলবি তাই আমরা করব !

জ্যোতি নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়।

কেদার এখন আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে জ্যোতির জিদ অনেক লড়াই করে বাজি জিতবার অহংকার আঁকড়ে থাকা থেকে আসেনি। এই একরোখামি আর কিছুই নয়, সে তার প্রেমের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে চায়। তার প্রেম আর পুরানো জীবন-ধাবায় বিশ্বাস একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এই বিশ্বাস ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই।

এ বিশ্বাসকে মর্যাদা না দিলে তার প্রেমের মান বাঁচে না, এ বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলে আঁকড়ে না থাকলে তার প্রেমও একটা ভুল হয়ে দাঁড়ায়।

পরিমল তার সঙ্গে নীচে নেমে আসে।

কেদার বলে, কী করা যায় ?

পরিমল বলে, আমিও উপায় ভাবছি।

কেদার বলে, হর্ষকাকার কাছে একবার যাই। তিনি নিজে এসে বুঝিয়ে বললে যদি কোনো ফল হয়।

পরিমল যেন আনমনেই বলে, হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখা যাক। না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য কী ব্যবস্থার কথা ভাবছ ?

এখনও ঠিক করিনি।

অগত্যা হর্ষ ডাক্তারকে আসতে হয় মেয়ের শ্বশুববাড়ি।

জনার্দন বলে, আসুন। আপনি নিজে ডাক্তাব, সময়মতো মেয়ের মাথাব চিকিৎসাটা করিযে রাখেননি ? আজ তাহলে এত ঝঞ্ঝাট হত না।

হর্ষ গম্ভীর মুখে জবাব দেয়, রোগ হবার আগে কি চিকিৎসা কবা যায় মশায় ? আগে তো ছিল না মাথার রোগটা।

জনার্দনের মুখ কালো হযে যায়।

মেয়েকে হর্ষ সোজাসুজি বলে, অ্যাম্বুলেন্স এনেছি জ্যোতি। হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতালে আমি যাব না।

এখানে থেকে মরবি ?

মরব কেন ? কবিরাজি ওষুধ খাচ্ছি তো।

শুধু ওষুধে হবে না। অপারেশন দবকার হতে পারে।

সে ও যা হয় ব্যবস্থা করবে।

সকলে অভিভূত হয়ে থাকে। এতগুলি মানুষের নীরবতায় ঘরটা থমথম করে।

পরিমল বোধ হয় সেই মুহূর্তে মনস্থির করে, কারণ তার মুখেব অসহায় ভাব কেটে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখা যায়।

ধমক দিয়ে বলে, পাগলামি কোরো না। আমি কবিরাজি ছেড়ে দিচ্ছি।

জ্যোতি বলে, সে কী ?

পরিমল জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি ঠিক করে ফেলেছি, অন্য কিছু করব। আমার ধাতে যা পোষাবে না সেটা আঁকড়ে থেকে লাভ কী ? দোকানে তালা দিয়ে এসেছি, আর খুলব না। যা দাম পাই বিক্রি করে দেব।

জ্যোতি খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না। করুণ চোখে চেয়ে থাকে।

পরিমল আবার বলে, কাজেই বুঝতে পারছ এ সব পাগলামির কোনো মানে হয় না তোমার। বাবা এসেছেন, ওঁর কথা শোনো।

খানিক পরে জ্যোতি বলে, বাবা, হাসপাতালে নয়, আমায় বাড়ি নিয়ে চলো।

হর্ষ বলে, তাই চলো।

## ১০

আশ্বিনের দুটি উজ্জ্বল দিন আর চাঁদ ও তারা-ভরা মনোরম রাত দারুণ কষ্ট ভোগ করে তৃতীয় দিন সকালে জ্যোতি যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেল একেবারে জ্ঞান হারিয়ে, ফিরে যা আর আসবে না মনে হল হর্ষ ডাক্তারের দুজন সমবয়সি নামকরা অন্তরঙ্গ ডাক্তার ভূপেশ ও কালীপদর।

বেলা তখন দশটা হবে।

শেষ রাত্রে আকাশে মেঘ ঘনিয়েছিল, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টিপি টিপি, আকাশ মেঘে ঢাকা, গুমোট হয়েছে এমন দারুণ যেন বাতাস ভান করেছে মরণের,—প্রচণ্ড ঝড়ের রূপ ধরে এসে এ তামাশা শেষ করবে আশঙ্কা হয়।

দোতলার দক্ষিণ কোণের ছোটো ঘরের হাওয়া পোড়া কয়লার গন্ধে ও ভাপে ভারী ও গরম। আবছা আঁধারটাও ভয় ও বিষাদে ভারী, চোখ কটকট করে, ভেতরে চাপ লাগে, জানালাগুলি প্রায় বন্ধ, মোটে দুটি জানালা ঘরে। ছোটো জানালাটির একটি খড়খড়ি শুধু তোলা। জ্যোতির ঠান্ডা লাগার আশঙ্কা। ঠান্ডা লাগার ফল সাংঘাতিক হতে পারে। সেঁকের ও তাপের উপকারিতা অনেক। তিনটে হট ওয়াটার ব্যাগ জ্যোতির গায়ে লাগানো হয়েছে। ভাঙা কড়ায়ে কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে শুকনো সেঁকের উপকারিতা আছে, ঘরে ঘরে চিরকাল প্রসূতিকে এভাবে সেঁক দিয়ে আসা হয়, ঘরের মধ্যেই কয়লা জ্বেলে।

দেয়াল ঘেঁষে পুরানো ছেঁড়া তোশকের ওপর মস্ত অয়েলক্লথ বিছিয়ে জ্যোতির বিছানা হয়েছে ! তোশকটা ছিঁড়ে কিছু নতুন তুলো দিয়ে নতুন তোশক করার কথা হয়েছিল গতবছর শীতকালে, হর্ষ ডাক্তারের মেজোমেয়ে কিরণ এসে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মাস ছয়েক ব্যবহার করে যাওয়ায় এমন অবস্থা হয়েছে তোশকটার যে তুলোও আর কোনো কাজে লাগবে না। অয়েলক্লথটা আগে কেউ ব্যবহার করেনি, ওটা হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারি থেকে আনা। জিনিসটা একটু পুরানো, কয়েকবছর দোকানে পড়ে থাকায় ফেটে চিড় খেয়ে গেছে, চলটা উঠতে শুরু করেছে। আস্ত একটা শিটের এটুকু কেউ কিনতে চায়নি, কম দামে দিতে চাইলেও নয়।

এতদিনে জিনিসটা কাজে লাগল।

জ্যোতির মাথায় একটা ওয়াড়হীন তেলচিটে বালিশ।

ভূপেশ ও কালিপদ অভিজ্ঞ ডাক্তার, কাজের বিষয় ছাড়া বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ডাক্তার হবার আগে পনেরো-বিশবছর এবং ডাক্তার হবার পরেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবছর ধরে প্রসবের ঘরে এই রকম গন্ধ, ভাপ বিছানাপত্রাদিই তাঁদের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা।

বাড়ির মেয়েরা ভিড় করে, কেউ কেউ কাঁদেও—যাদের প্রাণ খুব নরম। পাড়ার মেয়েরাও জড়ো হয় ! এ সবও স্বাভাবিক, সঙ্গত।

ডাক্তার কেউ উপস্থিত না থাকার সময় কী হয় না হয় তা নিয়েই বা হাঙ্গামা করার মানে কী আছে। চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিকমতো পালন করা হয়েছিল কিনা সে তো জিজ্ঞাসা করাই হয়।

নার্স শোভা তিনবার করে আসছে, সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায়। আজ সে এখনও এসে পৌঁছোয়নি, আসবার সময় মিনিট পনেরো পার হয়ে গেছে।

শোভা কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘড়িভক্তিপবায়ণা। আজ এসে দেরি হওয়ার জন্য, পনেরো-বিশ মিনিটের জন্য হলেও, বারবার কারণটা জানিয়ে ক্ষমা চাইবে সন্দেহ নেই,—ইতিমধ্যে জ্যোতির জ্ঞানহীন দেহটা যদি নিস্পন্দ প্রাণহীন হয়ে যায় তবুও সে কৈফিয়ত দিয়ে ক্ষমা চাইতে ছাড়বে না। ছেলেমেয়ে প্রসব করতে এত মেয়েকে মরতে দেখছে শোভা, কচি থেকে বয়স্কা মেয়েকে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, যে আরেকজনও ওভাবে মরেছে বলেই ঠিক সময়মতো নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছবার সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ কারণটা যতজনকে পারা যায় ব্যাখ্যা করে শোনাবে না কেন, একবার ছেড়ে দশবার শোনাবে না কেন, তা সে ভেবেই পায় না !

পশ্চিমা দাই রুক্‌মিনী হাজির আছে চব্বিশ ঘণ্টাই। তার তিন বছরের মেয়েটাকে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা কোনোমতে বস্তিতে তাদের ঘরে আটকে রাখা গিয়েছিল, তারপর থেকে সেও এ বাড়িতে স্থান পেযেছে। প্রসবাগারে তার ঢোকা বারণ, তবে ঘরেব সামনে সরু বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে সে ঠায় বসে থাকে।

মাঝে মাঝে সেখানে বসে বসেই ক্ষীণ টানা সুরে কাঁদে—মায়ের জন্য, খিদেয, একঘেয়েমিব কষ্টে।

রুক্‌মিনী কখনও তাকে ভেতরে নিয়ে যায় অল্পক্ষণের জন্য, কখনও নিজে বাইরে এসে তাকে একটু আদর করে বা কিছু খাইয়ে যায়,—অল্পক্ষণের মধ্যে।

ভূপেশ ও কালিপদ নীচে নামে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। ভূপেশেব নতুন ব্রাউন রঙের জুতোজোড়া শব্দ করে মচ্‌মচ্‌। স্পেশালিস্ট সে নয়, তবে স্ত্রীরোগের চিকিৎসায় নামডাক আছে। চোখা নাকের উপরে ছোটো ছোটো চোখ ঢেকে হাই-পাওয়ার চশমা, মাথায় কদমছাঁটা চুল। প্রায় সব চুলই পাকা কিন্তু সাদা নয়, ধোঁয়ায় যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ভূপেশ বলে, ভেতরে কিছু হয়েছে।

জ্যোতির ভেতরে কী হতে পারে কালীপদর কোনো ধারণা নেই। চড়া ব্যথা উঠেছে নেমেছে দুদিন ধরে, রক্তক্ষরণে এসেছে জোয়ার-ভাটা। অস্বাভাবিক রক্তস্রাবের কোনো কারণ যদি ঘটেই থাকে ভেতরে, ডেলিভারি বন্ধ হয়ে আছে কেন ? রক্তপাতের কারণ স্বতন্ত্র হলে তার মধ্যেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, তারপরও রক্তপাত চলবে, তখন চিকিৎসা হবে তার। প্রথম থেকে একটা সংশয় তাব মনে এসেছিল, ভূপেশ সমর্থন করেনি।

তুমি সিওর তো হে কেটে বার কবার কেস নয় ?

সিওর বইকী। মোটে সাড়ে ন-মাস। এগারো মাস হলেও আটকাত না।

জিভে একটা অস্বস্তির শব্দ করে ভূপেশ।

তাছাড়া মাথাটা এসে তো ঠেকত।

হর্ষকে কী বলবে ?

তাই ভাবছি। কাল বিকালেও সিওর ছিলাম, রাত্রের মধ্যে—

দুজনে নীচে নামলে একটি পনেরো-ষোলোবছরের ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে সসংকোচে প্রশ্ন করে : কেমন আছে ?

প্রশ্ন যে তার নয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কাছেই পাশের দেয়াল ঘেঁষে আধঘোমটা টেনে মোহিনীকে এবং জ্যোতির মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের কিছু নেই।

ভূপেশ জানে, জ্যোতির জ্ঞান ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। সে-ই জোর দিয়ে কথাটা বলে। সত্য কথা বলা অর্থহীন। এখুনি এরা মড়াকান্না জুড়ে দেবে।

হর্ষ এবং কেদার দুজনেই ডিসপেনসারিতে বসে ছিল। হর্ষ কাঠের পার্টিশন করা তার ছোটো কামরায়, কেদার বাইরে। স্প্রিং আলগা বলে হর্ষের কামরার ফোল্ডিং-দরজা সামান্য বাতাসে লড়বড় করে, তাকে বারবার দেখা যায়। আজ এখনকার গুমোটে দরজার পাট দুটি প্রায় নিষ্কম্প হয়ে আছে।

রোগীও আজ কম। জন তিনেক মাত্র এসেছে টিপিটিপি বৃষ্টিতে ছাতি মাথায় দিয়ে, আসাটা তাদের জরুরি। হর্ষ ডাক্তারের সঙ্গেই এদের সোজাসুজি কারবার, এদের সঙ্গে কেদারের সম্পর্ক নেই। একে একে হর্ষ ডাক্তারের সঙ্গে কথা কয়ে এসে দুজন বসে আছে নতুন ওষুধ তৈরি হবার প্রতীক্ষায়, বসে থাকতে থাকতে কেদারের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা মাত্র না করে মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা প্রশ্ন করে বসছে কেদারকে নিজের নিজের রোগীর রোগ সম্পর্কে, কেদার যেন সব জানে তাদের সম্পর্কে এটা অনায়াসে ধরে নিয়ে।

কেদার জবাব দিয়েছে নানারকম পালটা প্রশ্ন করে জানতে চেয়ে যে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। ভদ্রলোক দুজন তাই প্রশ্ন কমিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বিড়ি আর সিগারেট টানছে উদাসীনভাবে। বিড়ি যে টানছে তার ছেলের টাইফয়েড, আজ তেবো দিন। সিগারেটের স্ত্রীর বাধক, অম্বল, বুক ধড়ফড়, মাথার যন্ত্রণা, কান ভোঁ ভোঁ আর শুকনো কাশি, আজ তিন বছর। আজ সকালে চা খাওয়ার পর থেকে হিক্কা তুলছে আর বমি করছে।

কেদার : কদ্দিন বিয়ে করেছেন ?

শচীন সেন : এই বছর তিন-চারেক হবে।

কেদার : ছেলেমেয়ে ?

শচীন সেন : দুবার নষ্ট হয়ে গেল। প্রথমবার চার মাসে, পরেরবার পাঁচ মাসে। আচ্ছা, আপনার কী মত ? সবাই বলছে, একটি ছেলেমেয়ে হলেই সব সেরে যাবে। ডাক্তারবাবুও তাই বলেন। আপনি অবশ্য সবে পাশ করেছেন, তবু আপনিও তো ডাক্তার। আপনার কী মত বলুন না শুনি ?

কেদার : ছেলেমেয়ে হলে মোটামুটি সেরে উঠবে বইকী। কেন জানেন ?

শচীন সেন : বলুন না।

কেদার : মোটামুটি সেরে না উঠলে ছেলেমেয়ে হবে না। আগে স্ত্রীকে সুস্থ করুন—

শচীন সেন পাশ ফিবে মুখ ফিরিয়ে ফস্ করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে টেনে ফুঃ ফুঃ করে ধোঁয়া উড়িয়ে দেয়। এই জন্যই তো এ সব ছোকবা ডাক্তারকে কেউ বিশ্বাস করে না, ডাকে না। অল্প বিদ্যা আর অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে এরা ধাঁধায় কথা কয়, রোগ-ব্যারামটা যেন হালকা ইয়ার্কির ব্যাপার। হর্ষ ডাক্তার তো এ ভাবে কথা বলে না কখনও !

তৃতীয় ব্যক্তি রোগ আর চিকিৎসা গোপন রাখার জন্য দূর থেকে হর্ষ ডাক্তারের কাছে আসা যাওয়া করছে প্রায় দুমাস। নাম ঠিকানা সে যে মিথ্যা দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কেদার তিন-চারবার তার হাতঘড়ির ব্যান্ডে গোঁজা বাসেব টিকট দেখেছে দশ পয়সা দামের ! শহরের এক দেশ থেকে আরেক দেশে সে খুঁজতে এসেছে গোপনতা ও আরোগ্য !

নাম বলেছে শরৎচন্দ্র মুখার্জি। ঠিকানা দিয়েছে যে অঞ্চলের সেদিক থেকে হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে আসতে ট্রামডিপো থেকেও কেউ পয়সা খরচ করে না দু-তিনমিনিটের হাঁটাপথ ট্রামে চেপে যেতে।

এর সঙ্গেই হর্ষ ডাক্তার কথা বলছিল। ভূপেশ ও কালীপদ এসে পড়তে সে শরৎ মুখার্জিকে বলল, আচ্ছা, আপনি ও বেলা আসবেন সাড়ে চারটেয়। ইনজেকশনটা আনিয়ে রাখব।

সাড়ে পাঁচটায় আসব। পাঁচটা পর্যন্ত আপিস।

ও, হ্যাঁ। তাই আসবেন।

দুমাস ধরে নিয়মিত আসছে, বিকালের দিকে আপিসের জন্য সাড়ে পাঁচটা-ছটার আগে সে আসতে পারে না এ কথা কতবার বলেছে ঠিক নেই, তবু হর্ষ ডাক্তারের সেটা খেয়াল থাকে না। দুমাসে বিশেষ কোনো ফল না পেয়ে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা মন দিয়ে ভালোভাবে করছে না এ রকম

একটা খটকা লেগেছিল মনে। তার সম্বন্ধে হর্ষ ডাক্তারের অন্যমনস্কতার নতুন প্রমাণে খটকাটা হঠাৎ বুঝি জোরালো সংশয়ে পরিণত হয়ে গেল, তাই তার মুখের ভাব দেখে কেদারের মনে হল, হর্ষ ডাক্তার বুঝি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে তার বাঁচবার কোনো ভরসা নেই।

এমনি নিরীহ গোবেচারীর মতো চেহারা, মুখে কাব্যরোগী কিশোরের করুণ ম্লানিমা মেশানো অসংযত মধ্য যৌবনের বিবর্ণ পাঁশুটে ভাবের সঙ্গে, তার ওপর এই গভীর হতাশার ছাপ।

দেখে বড়ো মায়া হল কেদারের। অন্য দুজন ওষুধ নিয়ে চলে গেছে। শরৎ ধপাস করে বসে বলে, আপিসে লেট হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু কী বললেন ? আহাহা ভড়কে যাবেন না। আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমাকে সব জানতে হয়। ওঁর কাছে যা প্রাইভেট ব্যাপার, আমার কাছেও তাই। আমাকেও সব গোপন রাখতে হয়। ধরুন, উনি ক-দিনের জন্য বাইরে গেলেন, আপনার ট্রিটমেন্টের ভার তো আমাকেই দিয়ে যাবেন ?

হর্ষ ডাক্তারের এত অন্তরঙ্গ হয়েও তার কাছে ডাক্তারবাবু কী বললেন জানবার দরকার কেদারের কেন হল, এ প্রশ্ন অবশ্য শরতের মনে আসে না।

ও বেলা ইনজেকশন দেবেন বললেন।

কটা হল ?

আজ থেকে দেবেন। ইনজেকশনের ওষুধটা আনিয়ে রাখবেন বললেন।

ইনজেকশনের ব্যবস্থা গোড়ার দিকেই করা উচিত ছিল। কথাটা শরৎকে বলতে ইচ্ছা হয়, বলতে পারে না। বললে অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না কিছুই, বিশ্বাস হর্ষ ডাক্তার করেনি তাকে। তার ডিসপেনসারিতে এখানে দোকানের কর্মচারীর মতো বসতে দিয়েছে এইটুকু বিশ্বাস, স্নেহ আর অনুগ্রহ।

ইনজেকশনের কথা আগে বলেছিলাম ডাক্তারবাবুকে। এটা নির্দোষ কথা, সত্যও বটে।—কারা তৈরি করেছে ?

কী তৈরি করছে ?

শুনে খটকা লাগে কেদারের, কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ জাগে। আরও দু-চারটি কথা জিজ্ঞেস করে মনটা তার ঘা খেয়ে নড়ে ওঠে। রোগীর শরীরের বিষ নিয়ে ইনজেকশনের ওষুধ তৈরি করতে দেয়নি হর্ষ ডাক্তার, কী ইনজেকশন তবে যে দেবে শরৎকে তার এ রোগের জন্য ? এটুকু কি তার জানা নেই যে ওভাবে তৈরি করা বিশেষ সিরাম ছাড়া এ রোগে ইনজেকশনের আর কোনো ফলপ্রদ ওষুধ হয় না ?

তাই বা কী করে সম্ভব হয় ! এ তো সহজ, সাধারণ জ্ঞান ! তবে কি জেনে শুনে ইচ্ছে করেই হর্ষ ডাক্তার ওকে ভাঁওতা দিচ্ছে, হাঙ্গামা আর ভাগে টাকা কম পড়া এড়াবার জন্য ? আশ্চর্য কী ! ক-মাস ধরে সে তো দেখছে হর্ষ ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা !

কত দাম বললেন ?

পাঁচ টাকা করে। সাতটা লাগবে।

শরৎ হঠাৎ কাঁদোকাঁদো হয়ে পড়ে।

টাকার জন্য ভাবি না মশায়। অনেক টাকা দিয়েছি, আরও নয় পঞ্চাশ একশো যাবে। সেরে যাবো তো ?

সেরে যাবেন বইকী ! নিশ্চয় সেরে যাবেন।

যন্ত্রের মতো কেদার তাকে ভরসা দেয়।

কবিরাজি করে দেখব একবার ? নয় হোমিয়োপ্যাথি ?

আমি কী বলব বলুন ?

শরৎ চলে গেলে পার্টিশনের ও পাশ থেকে তিন ডাক্তারের কথা কাটাকাটি কেদারের কানে আসে। এতক্ষণ কোনো দিকে তার মন ছিল না।

হর্ষ ডাক্তার একটু চটেছে মনে হয়।

পালকে ডাকতে বলছ ? পাল কি তোমার আমার চেয়ে বেশি বোঝে বলতে চাও ?

ভূপেশ বলে, আহা তুমি বুঝতে পারছ না কথাটা। তোমার মেয়ে তো ধরতে গেলে আমারই মেয়ের মতো। অপারেশন যদি করতে হয়, আমার করা কি উচিত হবে ? আমরা যতই হোক ঘবের লোক, বাইরের একজনকে আনিয়ে কনসাল্ট করাও দরকাব।

কেদার ভাবে, এ সুবুদ্ধি গোড়ায় হল না কেন ?

কালীপদ বলে, না না, তুমি ইতস্তত কোরো না হর্ষ। হয় পালকে ডাকো, নয় হাসপাতালে পাঠাও মেয়েকে। হাসপাতালের মুখার্জি শুনেছি এ সব অপারেশনে বেশ ভালো।

পাড়ার কুমুদ সেনের বাড়িতে একবার ডাঃ পালকে ডাকা হয়েছিল কনসালটেশনের জন্য।

সকলের সামনে ডাঃ পাল কিছু বলেনি, আড়ালে নাকি কড়া কড়া কথা শুনিয়েছিল হর্ষ ডাক্তারকে, রীতিমতো অপমান করেছিল।

সেই আঘাতে হর্ষ ডাক্তার আজও মনে মনে আহত হয়ে আছে, ডাঃ পালের নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে।

ডাঃ পালকে আনলেই সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু আরও তো স্পেশালিস্ট আছে শহরে ? হর্ষ ডাক্তারের মর্মান্তিক বিদ্বেষের খবর জেনেও ওরা তাদের একজনকে আনাবার কথা না বলে ডাঃ পালকেই ডাকবার জন্য জোর করছে কেন ?

মেয়েকে হাসপাতালে পাঠাতেই বা হর্ষ ড.ক্তাবের আপত্তি কীসের ?

ডাক্তারের কি হাসপাতাল সম্পর্কে ভয় বা কুসংস্কাব থাকা সম্ভব ?

সাধারণ রোগীর বেলা যাই ঘটুক হাসপাতালে, হর্ষ ডাক্তারেব মেয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে, বিশেষত সেখানকার ডাক্তার মুখার্জি এবং হয়তো আরও দু-চারজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যখন এদের জানাশোনা আছে। এ কী ছেলেখেলা, না এটাই সম্ভব ডাক্তারি ব্যবসায়ে ?

শরৎ আর জ্যোতি ধাঁধা হয়ে জড়িয়ে যায় কেদারের মনে। মৃত্যুভয় আঁকা শরতের মুখ, জ্যোতির মুখে মরণের চিহ্ন। শরৎ না হয় অজানা অচেনা পর,—রোগী ডাক্তারের পর এটা মানতে চায় না কেদারের কাঁচামন—তবু নয় মেনে নেওয়া গেল বাস্তব সত্যটাকে যে শরৎ হর্ষ ডাক্তারের কেউ নয়, কিন্তু জ্যোতি তো মেয়ে। সে আর তার দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চেয়ে বড়ো ডাক্তার জগতে নেই, তারা জানে না এমন কিছু ডাক্তারি বিদ্যায় থাকাই অসম্ভব, এ অভিমানও না হয় মেনে নেওয়া গেল, ডাক্তারও মানুষ বলে, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যযুক্ত সাধারণ মানুষ বলে।

কিন্তু নিজের মেয়ের মরণাধিক এমন যন্ত্রণা আর মরণ-বাঁচনটাও কি সে অভিমানকে গলাতে পারে না ? বন্ধুর অভিমানকে খাতির করে দুই প্রবীণ বন্ধু দুদিন চুপ করে থাকতে পারে ?

কেদার উঠে ভেতরে গিয়ে একপাশে দাঁড়ায়।

হাসপাতালেই পাঠাও তবে। কেদার, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি বার করুক।

গাড়িতে হবে না। অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে টেলিফোন করে দাও। বোলো আর্জেন্ট।

হর্ষ ডাক্তারের যেন চমক ভাঙে—সে কী হে ? তোমরা তো কিছু বলোনি আমায় !

ভূপেশ বলে, সাডেন টার্ন নিলে, আগে কিছু টের পাইনি। আমি বলি কী, পালকে একবার দেখিয়ে—

হর্ষ ডাক্তার গুম খেয়ে বসে থাকে।

কেদার ধৈর্য হারিয়ে বলে, হর্ষকাকা, আমি গিয়ে নিয়ে আসি ডাঃ পালকে। উনি আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, বললেই আসবেন।

সে হর্ষ ডেকেছে শুনলেও আসবে, ভূপেশ বলে।

হর্ষ ডাক্তার মুখ তুলে বলে, তাই বরং যাও কেদার। আমি ডেকেছি বলার দরকার নেই। তুমিই যা বলবার বলে নিয়ে এসো। বরং বোলো যে তুমিই ভার নিয়েছিলে, হঠাৎ খারাপ টার্ন নেওয়ায় ভরসা পাচ্ছ না—হর্ষ ডাক্তার ঠোঁট কামড়ে একটু থেমে বলে, জ্যোতিকে একবার দেখে যাও।

আমি কী দেখিনি হর্ষকাকা ? কতবার করে দেখছি রোজ। বলতে সাহস পাইনি, নইলে—

হর্ষ ডাক্তারের পুরোনো গাড়িতে ডাঃ পালের বাড়ির দিকে যেতে যেতে কেদার ভাবে . সাহস পায়নি বলতে। মুখ দিয়ে সত্য কথাটাই বেরিয়ে গেল ? দুজন প্রবীণ অভিজ্ঞ ডাক্তার জ্যোতির ভার নিয়েছে, তার কিছু বলা সাজে না, এই যুক্তিতে সে তবে চুপ করে থাকেনি ? তা ছাড়া আর কি ! কেবল জ্যোতির ব্যাপারে তো নয়, আরও কত বিষয়ে নিজের ভীরুতার জন্যই সে চুপ করে থেকেছে—তার নিজের ভালোমন্দ অধিকার অনধিকারের বিষয়েও অন্যায় পর্যন্ত সহ্য করে।

কেমন এলোমেলো হয়ে যায় কেদারের চিন্তাগুলি, সে জ্বালা বোধ করে। নালিশ, আপশোশ, অনিশ্চয়তা, ফাঁকি আর ফাঁদে পড়ার জ্বালা। এতকাল ধরে এত সমারোহ এত আয়োজনের পর সে কীসের জন্য তৈরি হয়েছে, তার পেশা ও কাজের আসল রূপ কী, কী তার সংগ্রাম, কী জন্য, কাব জন্য, কীসের সঙ্গে ?

ডাঃ পাল বেরিয়ে গেছে। নার্স অণিমার বাড়ি গেছে। কখন ফিববে ঠিক নেই।

ডাঃ পালের একজন মুখচেনা তরুণ স্তাবক যন্ত্রেব মতো জানিয়ে দেয। কে জানে সেও কেদারের মতো নতুন ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করেছে কি না !

ওখানেই চলুন তা হলে।

কেদার নির্দেশ দেয় ড্রাইভার অনন্তকে।

ওখানে গিয়ে কী হবে ? বাড়ি চিনি না।

আমি চিনি। জোরে চালান।

অনন্ত কাল মদ খেয়ে রাত জেগেছে। চোখ টান করে সে যেন প্রায় কটমটিয়েই মুখ ফিবিয়ে তাকায়। তারপর কী ভেবে গাড়িটা একদম বিপজ্জনক বেখাপ্পা স্পিডে চালিয়ে দেয়।

কেদার মনে মনে বলে : এমন বাঁদর না হলে হর্ষ ডাক্তার একে পোষে ? ভাটিখানার পোষা জীব !

নার্স অণিমার বাড়ি কেদার কখনও যায়নি, ঠিকানাটা শুধু জানা ছিল। বাড়ি খুঁজে বাব করতে সদর দরজার ভেতর দিকে সিঁড়ির নীচে দেখা হয় অণিমার স্বামী শশীনাথের সঙ্গে।

জীর্ণ শুকনো চেহারা, চুলগুলি সব পাকা, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। বয়স অনুমান করা কঠিন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি।

মুখে রাত্রে গেলা দেশি মদের সকাল বেলার দুর্গন্ধ।

কাকে চান ?

আমি হর্ষ ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি।

অ ! তা কী জানেন, উনি তো যেতে পারবেন না আজ ! একটু কী জানেন, মুশকিল হয়েছে।

ডাঃ পাল আছেন, না চলে গেছেন ?

আছেন। ওনাকে দেখছেন। বড়ো ভালো লোক, অত বড়ো বিলেত-ফেরত ডাক্তার, এত নাম-ডাক, আমি গোড়ায় ভরসাই পাইনি ডাকতে যেতে। উনি বললেন, যাও আমার নাম বললেই আসবেন। তা, গিয়ে বলামাত্র ছুটে এলেন। নিজের ড্রাইভারকে পাঠিয়েছেন ওষুধপত্র কী সব আনতে।

কী হয়েছে মিসেস দাসের ?

আর বলেন কেন, বুড়ো বয়সে কী কেলেঙ্কারি। কী ফাঁদই পেতে রেখেছেন ভগবান, রেহাই নেই আর। ছোটো মেয়েটার বয়েস মশায় আমার পনেরো বছর।

প্রায় চোখ বুজে সৃষ্টির অনিবার্য দুর্বোধ্য বিধানের খাপছাড়া পরিহাসের প্রতিবাদে শশীনাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। মাথা নাড়তে নাড়তেই সে অবশ্য জানিয়ে দেয় ব্যাপারটা কী হয়েছে। চার-পাঁচমাসের সন্তান-সম্ভাবনা ছিল অণিমার ; শেষ রাত্রে ব্যথা উঠে মিসক্যারেজের উপক্রম হয়েছে অথবা এতক্ষণে ঘটেছে।

এ রকম ঘটে, সৃষ্টি ছাড়া কিছু এটা নয়। ব্যাপারটা দুঃখেরও বটে আপশোশেরও বটে। কিন্তু ক-দিন আগেও নার্স অণিমাকে কেদার দেখেছিল আর তার অজস্র কথা শুনেছিল বলেই বোধ হয় ঘটনাটা কেদারের কল্পনায় উদ্ভট একটা তামাশার মতো মনে হয়। পনেরো বছর অণিমা অন্য মেয়েদের প্রসব করিয়ে এসেছে, নিত্য-প্রসাধনের মতোই ওটা বোধ হয় তার কাছে সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল, আজ সে নিজেই পড়েছে ফাঁদে।

ছি ! নিজের ওপর চোখ রাঙায় কেদার। একটি মায়ের বহু বিলম্বিত মাতৃত্বের সম্ভাবনা ব্যর্থ হওয়া কী কম শোচনীয় কথা। তার নিজের মায়েরও ছোটো ছেলেমেয়ে দুটির বয়সের তফাত তো হবে প্রায় দশ-এগারোবছর—ছোটো খুকি যখন জন্মায় মা-র বয়স তাব চল্লিশের দিকে ঘেঁষেছিল। কী কষ্টই মা পেয়েছিল ছোটো খুকি হবার সময়।

## ১১

ডাক্তার পালের নেমে আসার জন্যে কেদারকে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ।

অণিমার অবস্থা গুরুতর সন্দেহ নেই। ডাক্তার পাল স্নেহও করেন খানিকটা অণিমাকে। দায়ে পড়া কর্তব্য পালনে এত সময় দেওয়া ডাক্তার পাল কেন, তার চেয়ে অনেক কম নাম-করা ডাক্তার যাদের শশীনাথ চেনে, তাদেরও নাকি স্বভাব নয় ! আর নিজে ভার নিয়ে সব করা !

শশীনাথের কৃতজ্ঞতার আবেগে উচ্ছ্বসিত কথা থেকে ডাক্তার পাল যা যা করেছে জানা যায়। এ যেন সত্যই একটা প্রমাণ যে যতই শক্ত আর ভোঁতা হয়ে যাক মানুষের হৃদয়, হৃদয় যদি থাকে কোমলতাও থাকবে !

বসে থাকতে থাকতে অণিমার কনিষ্ঠা কন্যাটির দর্শনলাভ ঘটে কেদারের। বাপের জন্য সে চা নিয়ে আসে কলাই করা ছোটো মগে—কাপে বোধ হয় শশীনাথের চায়ের তৃষ্ণা মেটে না। রীতিমতো চা-খোর মানুষ।

বয়স মেয়েটির পনেরো-ষোলো বছর হবে, ফ্রক পরে থাকলেও এবং বেণী পিঠে দুললেও। বেশ মোটা-সোটা গোলগাল মেয়েটি অণিমার, দিব্যি আদুরে-আদুরে চেহারা। কচি মুখখানা দেখে একটু স্বস্তি বোধ না করলে কেদার নিশ্চয় মেয়েটার এমন বেখাপ্পা বেশের জন্য ওর বাপ-মাকে মনে মনে গাল দিত। সস্তায় কেনা বেমানান ফ্রকটাতে বেচারির বাড়ন্ত দেহটি যেন এই ঘোষণায় পরিণত হয়েছে—এ আর কী বেড়েছি, কাল পরশু দেখো !

চা খাবেন নাকি এক কাপ ? একটা কাপ আন তো বুনু।

মগের কানায় কানায় ভরা প্রায় দুধহীন কড়া লালচে চায়ের দিকে চেয়ে কেদার তাড়াতাড়ি বলে, না না, চা খাব না।

বুনুর কচিমুখে দেখা দেয় সবজান্তা হাসি।

নরম চা করে দিতে পারি ঠিকমতো দুধ দিয়ে, যদি বলেন।

থাক, দরকার নেই।

হাঙ্গামা কিছু নেই কিন্তু। হাঁড়িতে জল ফুটছে।

এবার কেদার হেসে বলে, তবে আনো।

কেদারের মন বুঝে তার মত বদলিয়ে তাকে চা করে এনে খাওয়াতে পারায় ভারী খুশি মনে হয় বুনুকে। ডাক্তার পাল নেমে আসা পর্যন্ত তাদের আলাপ এগোয়। থার্ড ক্লাসে পড়ছে বুনু। এবার সেকেন্ড ক্লাসে উঠত, ফিফথ ক্লাসে পড়বার সময় তার ভীষণ অসুখ হয়েছিল, একবছর তাই পিছিয়ে গেছে। এবারের আগের বারের পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল, এবার পারেনি। মা তাকে দিয়ে রাঁধাবাড়া করায়, বলে, শুধু লেখাপড়া করলেই হয় না মেয়েদের, রাঁধাবাড়াও শিখতে হয়। বেশি না পড়লে ফার্স্ট হওয়া যায় ?

খেলা কর না ?

শুনে চোখের পলকে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে যায় বুনুর মুখ। আচমকা সে যেন বদলে যায় আগাগোড়া, শিশু ও মিষ্টি থেকে পাকা আর তিতো।

কীসের খেলা ?

ঝাঁজালো সুরে সে পালটা প্রশ্ন করে।

কেদার ভড়কে গিয়ে বলে, এই স্কুলের মেয়েরা যা খেলে, দৌড়ানো, স্কিপিং, ব্যাড্‌মিন্টন—

আমি মোটা বলে বুঝি বলছেন খেলাধুলো করি না ?

চোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকে বুনু।

না না, তা বলিনি। আমি তা ভাবিওনি। সত্যি বলছি।

আমতা আমতা করে কেদার কৈফিয়ত দেয়। অবস্থা সহজ করে আনার জন্য হঠাৎ সহজভাবে হেসে জিজ্ঞেস করে, পুতুল খেলা কর তো ?

বুনুর মুখের ভাব এতটুকু বদলায় না। বরং মনে হয় সে যেন আরও বেশি আহত হয়েছে।

পুতুল খেলা ? ফ্রক পরে থাকি বলে জিজ্ঞেস করছেন বুঝি ?

কেদার আর কী বলবে, অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সে একেবারে চুপ হয়ে যায়।

বুনু কিছুক্ষণ মনে মনে বিচার ও বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করে বলে, ছেলেবেলার সেই অসুখের পর আমি মোটা হয়েছি। খেলাধুলো না করার জন্য নয়।

কেদার সায় দিয়ে বলে, ও!

বাড়িতে ফ্রক পরি কেন জানেন ? আমার মাসিমা আমায় ফ্রক কিনে দেয়। ফ্রক না পরে শাড়ি পরলে মাকে কিনে দিতে হত। আমি ফ্রক পরি বলে গরিবের সংসারে সাহায্য হয়।

তা তো বটেই।

মাসিমা ফ্রকের বদলে শাড়ি কিনে দেয় না কেন ভাবছেন তো ? মাসিমার একটু ছিট আছে মাথায়। আমি শাড়ি চাইলে বলে, বড়ো হয়ে পরিস।

তা তো জানতাম না।

না জেনে যা-তা ভাবেন কেন একজনের সম্বন্ধে ?

এতক্ষণে শশীনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, কিন্তু মেয়েকে সে ধমকায় না। গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলে, কী বকর বকর আরম্ভ করলি বুনু ?

বুনুও বিরক্তির একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে ভেতরে চলে যায়।

খানিক পরেই ডাক্তার পাল নীচে নামে।

বলে, কেদার ? তুমি এখানে ?

কেদার বলে, একটু দরকার ছিল।

তার দরকারটা কী না শুনেই ডাক্তার পাল শশীনাথের সঙ্গে কাজের কথা পাড়ে : নষ্টই হয়ে গেল। উপায় ছিল না।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভয়ের কিছু নেই, তবে হার্ট একটু খারাপ। কয়েকদিন পারফেক্ট নার্সিং চাই। ভালো নার্স আনাতে পারবেন একজন ?

উনি পারবেন বইকী।

ডাক্তার পালের দুপাটি দাঁত দু-তিনবার ঘষাঘষি করে পরস্পবেব সঙ্গে।

উনি পারবেন মানে ? উনি তো ক-দিন বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।

শশীনাথ তাড়াতাড়ি জিভ কাটে।

উনি কী নিজে যাবেন ডাকতে ? তা বলিনি। অনেকেব সঙ্গে চেনা আছে, উনি ডেকেছেন শুনলে আসবে। আসবে না তো কী, তাদের বিপদে-আপদে উনি যান না, করেন না ?

অ ! একজন ভালো নার্সকে আনান। ওষুধ পথ্য ঠিকমতো চলবে, কিন্তু পারফেক্ট বেস্ট সবচেয়ে দরকারি।

শশীনাথকে একেবারে যেন বাতিল করে এবার ডাক্তার পাল কেদারের দিকে ফিরল।

কী ব্যাপার কেদার ?

আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে চোখ প্রায় বন্ধ করে ডাক্তার পাল এমন এক দীর্ঘনিশ্বাস টানল ও ফেলল যে তার সীমাহীন শ্রান্তি যেন তুষাবের হিমস্পর্শের মতো স্পর্শ করল কেদারের হৃদয়-মনকে। এক মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু কী দীর্ঘ তার ইতিহাস। ডাক্তারি করে করে চুল প্রায় সব পেকে গিয়েছে ডাক্তার পালের। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে কত আত্মীয়বন্ধু স্নেহাস্পদ এমনি বেহিসাবি বেপরোয়া অন্যায় আব্দার তাকে জানিয়েছে, আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে ! যার সুযোগ জুটেছে সে-ই চেয়েছে এই সুবিধা—ভালো ডাক্তার সে, তাকে দিয়ে বিনা পয়সায় আপনজনের সর্দি থেকে যক্ষ্মা পর্যন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়ে নিতে। একটি দীর্ঘনিশ্বাসে ডাক্তার পাল যেন তাকে বলল : প্রায় একটা বাজে। এখনও বাড়ি যাইনি, নাইনি, খাইনি। দেহটা শ্রান্ত, অবসন্ন। একটু বিশ্রামের জন্য মরছি। এমন সময় তুমি এসে বললে যেতে হবে ! আমিও জানি, তুমিও জানো, বিশেষ দাবি তোমার আছে। তুমি সেই দাবি খাটাতে এসেছ। উপায় কী, আমাকে যেতেই হবে। না গেলে আমার মেয়ে গীতা রাগ করবে, তুমি রাগ করবে, আমি হব মন্দ, স্বার্থপর লোক !

কেদার আর্তস্বরে বলতে যায়, আমা' বাড়িতে নয়, হর্ষ ডাক্তার—

ডাক্তার পাল হাই তুলে বলে, হর্ষ দেখছিল ? কেসটা কী ?—চলো যাই, গাড়িতে শুনব।

বুনু এসে কখন দাঁড়িয়েছিল কেউ দেখেনি। কেদারের পাঞ্জাবির প্রান্ত টেনে সে চুপিচুপি বলে, আপনি ডাক্তার ? একদিন আসবেন ? কথা আছে।

কী কথা বুনু ?

দরকারি কথা। আসবেন।

বলে সে অন্দরে মিলিয়ে যায়।

গাড়িতে কেদার সব কথা খুলে বললে ডাক্তার পাল যেন আরও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। অনুযোগ দিয়ে বলে, আগে বলোনি কেন তোমার বাড়ির কেস নয়। তোমরা ইয়ংম্যান, এমন তাড়াহুড়ো কর ! হর্ষনাথের বাড়িতে তো আমি যেতে পারব না !

আপনি না গেলে মেয়েটা মরবে।

ডাক্তার পাল আশ্চর্য হয়ে বলে, তুমি কি পাগল হয়েছ কেদার ? ডাক্তার হয়ে এমন কথা বলছ ? কোনো একজন ডাক্তার পাওয়া গেল না বলে কোনো রোগী মারা যায় ? ও রকম ধন্বন্তরি ডাক্তার তো আজ পর্যন্ত জগতে জন্মায়নি ! কলকাতা শহরে আমার মতো কত স্পেশালিস্ট আছে, তাদের একজনকে ডাকো। নয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। আমি গিয়ে যা করব, অন্যেও তাই করবে। তুমি যা বিবরণ দিলে কেসটার, তাতে মনে হয়—নাঃ, রোগী না দেখে কোনো ওপিনিয়ন দেওয়া যায় না।

কেদার সাগ্রহে বলে, তবেই দেখুন, আমার মুখে শুনেই আপনি ধরতে পেরেছেন। আপনি একবার চলুন।

যাওয়ার কথা কানে না তুলে ডাক্তার পাল বলে, আমি কিছু ধরতে পারিনি কেদার। তোমাব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার ডায়োগনসিসটাই ঠিক—টুইন কমপ্লিকেশন। সোজা ব্যাপাব। কমপ্লিকেশনটা কী জেনে ঠিক করে দিলেই ওয়ান আফটার অ্যানাদার ডেলিভারি হয়ে যাবে। স্রেফ পজিশনের গোলমাল, ঠিক করে দিলেই হল। যে কোনো সাধারণ ডাক্তার পারে।

সোজা কেস হলে ওরা দুজন ধরতেও পারলেন না ?

ডাক্তার পাল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। গাড়ি তার বাড়ি অথবা হর্ষ ডাক্তারের বাড়িব পথে মুখ ঘুরোবার মোড়ে এসে পৌঁছানোয় ড্রাইভারকে গাড়ি দাঁড় করাতে হুকুম দেয়। কথা যখন বলে, মনে হয় কথা বলতে তার ক্লেশ হচ্ছে, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা পীড়ন করছে তাকে।

হয়তো তা হলে কেসটা সোজা নয়। তোমাব ডায়োগনসিস ভুল। কিন্তু কি জানো কেদার, তুমি ছেলেমানুষ, সবে ডাক্তারি পাশ করেছ, তোমাকে বলতে লজ্জা করে, অনেকে অনেক সময় সোজা কেস ধরতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে নয়, স্বভাবের দোষে। রোগটা কী হওয়া উচিত না ভেবে ভাবে রোগটা এই হওয়া উচিত। সকালে রোগীকে দশ মিনিট দেখে যদি একবার ঠিক করল রোগটা এই, বিকালে আরও হাজার রকম সিম্প্টমে যদি স্পষ্ট বোঝা যায় রোগটা অন্য কিছু, তবু সেগুলি গ্রাহ্য না করে শুধু হাতড়ে বেড়াবে কোন সিম্প্টমগুলি তার সকালের ডায়োগনসিসকে সাপোর্ট করে। অনেকে আবার চায় না যে তার রোগীর রোগটা সহজ সাধারণ কিছু হোক—কঠিন জটিল দুরারোগ্য কিছু হলে সে খুশি হয়। বিভূতি সেনকে তো তুমি চেন, কাশির রোগী পেলেই ও মহোৎসাহে পরীক্ষা করাবে টি বি সন্দেহ করার একটা সামান্য কারণ পর্যন্ত হয়তো নেই। কেউ আবার ঠিক উলটো। ধরণী যেমন। গোড়াতেই ধরে নেবে, রোগটা সাধারণ। চেহারায় টি বি-র ছাপ নিয়ে যদি কেউ আসে, সামনে কাশতে কাশতে রক্ত তোলে, তবুও চেষ্টা করবে রোগটা সাধারণ কাশিতে দাঁড় করিয়ে চিকিৎসা করতে।

ইতস্তত করে ডাক্তার পাল একটা চুরুট ধরিয়েই ফেলে—নেয়ে খেয়ে যেটা ধরাবে ঠিক ছিল।

তবু আমি ডাক্তারদের দোষ দিই না। ডাক্তাররা মানুষ, দশজনের মতো মানুষ। চাকরির মতো ডাক্তারিটা তাদের অধিকাংশের নিছক পেশার মতো—যে সব বিশ্বাস কুসংস্কার দুর্বলতা নিয়ে তারা আপিসে চাকরি করত, সে সব নিয়েই তারা ডাক্তারি করে, পয়সার জন্য। কী করবে তারা ? আর কিছু করবার নেই। ডাক্তারের মন তারা কোথায় পাবে, কি করে পাবে ? রোগীর মন আর তার মনে তফাত নেই—সে শুধু জানে এই এই অবস্থা হলে এই এই ওষুধ আর এই এই পথ্য ব্যবস্থা করতে

হয়। সেটা তুচ্ছ নয়। না কেদার, সেটা তুচ্ছ নয়। একজন জ্বরের রোগীর ম্যালেরিয়া হয়েছে ধরতে পেরে কুইনিন দিয়ে তাকে সারিয়েছে যে ডাক্তার, আর কোনো রোগ ধরে সে যদি ঠিক চিকিৎসা করতে না পারে, তবু তার কাছে দেশের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কেন ?

ডাক্তার পাল যেন ঘুম থেকে জাগে।

তুমি কি এখানে নামবে ?

আপনি একবার চলুন।

এ অনুরোধের জবাবে ডাক্তার পাল ড্রাইভারকে বাড়ি যেতে হুকুম দেয়।

কেদারকে বলে, তুমিও আমার ওখানেই নেয়ে খেয়ে নেবে চলো। গীতা বলছিল, তুমি অনেকদিন যাওনি।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে কেদার নেমে যায়।

কী করব বুঝতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে।

ডাক্তারের অসুখের চিকিৎসাও ডাক্তারই করে। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় মাথা ঘোরাটা অসুখ নয়। ডাক্তার পালের গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে যায়।

নিখুঁত ব্যঙ্গ যেন। ডাক্তাররাও মানুষ, সাধারণ দুর্বল মানুষ ! হর্ষ ডাক্তার প্রমাণ দিয়েছিল ডাক্তার পালকে ডাকতে না চেয়ে, ডাক্তার পাল অকাট্য প্রমাণ দিয়ে গেল হর্ষ ডাক্তারের মেয়েকে বাঁচাতে যেতে অস্বীকার করে। ডাক্তার পাল ধন্বন্তরি নয়। অন্য একজন স্পেশালিস্ট ডেকে বা হাসপাতালে পাঠিয়ে সে যা করত তা করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু এ কী একটা যুক্তি ডাক্তারের পক্ষে চিকিৎসা করতে না চাওয়ার ! কেদার জানত ডাক্তার পালের সমালোচনার আঁচড়ে স্থায়ী ক্ষত হয়েছিল শুধু হর্ষ ডাক্তারের মনে। কিন্তু সে অনেক বড়ো ডাক্তার, সে ভুল দেখিয়ে উপদেশ দিলে শিষ্যের মতো শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ হওয়ার বদলে হর্ষ ডাক্তার দুর্বিনীতের মতো অপমান বোধ করেছে, এই অভিমানের ক্ষত যে ডাক্তার পালকেও কাবু করে রেখেছে এতকাল, তা কি কল্পনা করা গিয়েছিল।

কড়া রোদে দাঁড়ানো যায় না। কয়েক হাত দূরের ডাস্টবিন থেকে চলতি দুর্গন্ধের বদলে প্রায় অপরিচিত ও উৎকট একটা গন্ধ উঠে আসছে। কী একটা ভুলে যাওয়া কষ্ট যেন মনে পড়িয়ে দিতে চেয়ে পারছে না। ভিতরের ক্ষোভটা কটু : হাসি না কান্নার পাল্লায় ভারী বোঝা যাচ্ছে না। এত দুঃখেও তামাশার মতো লাগছে যেন সব। ডাক্তার হয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে সে মিশছে মাত্র কটা মাস, মাত্র কয়েকজনের সঙ্গে, তাও অনেকটা ছাত্রেরই মতো। চিকিৎসা জগতের এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিজ্ঞতা তার ভরে উঠেছে কত অমার্জনীয় দুষ্টতার টুকরো টুকরো উদাহরণে। জলজ্যান্ত বাস্তব ইঙ্গিত সেগুলি, অবিস্মরণীয়। কিন্তু দুঃখ বোধ করার চেয়ে বেশি বিচলিত সে হয়নি। আর আজ ডাক্তার পালের মন নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আবিষ্কারের ক্ষোভ তার দেহমনকে অবসন্ন করে আনছে।

ডাক্তার পালের মতো ডাক্তারের যদি রোগের সঙ্গে লড়বার পিছনে কোনো আদর্শের প্রেরণা না থাকে যুদ্ধের ভাড়া করা সেনাপতির মতো তবে আর আশা ভরসা কী থাকে ? চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান আর নতুন নতুন জ্ঞানসঞ্চয়ের অদম্য কামনা আছে বলেই তো কেদার তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে আসেনি। জীবনধর্মের মূলনীতিতে তার নিজের যে বিশ্বাস তারই সমগোত্রীয় বিশ্বাসের অস্তিত্ব সে অনুভব করে এসেছে ডাক্তার পালের মধ্যে। বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সে বিশ্বাসের কোনো স্মরণযোগ্য উদাহরণ সে কখনও ঘটতে দেখেনি বটে, সেও আর দশজনের মতোই মোটা ফি নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করেছে, বড়ো জোর কোনো ক্ষেত্রে রেয়াত করছে ফিয়ের একটা

অংশ। গরিব রোগী তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু এই মাপকাঠিতে তাকে বিচার করার কথা কেদার কোনোদিন ভাবেনি, আজও ভাবে না। রোগী যেই হোক, চিকিৎসা করার সময় ব্রতপালনের মতো তার একান্ত নিষ্ঠা কেদারকে মুগ্ধ করেছে, রোগীর জন্য তার দরদ কেদারকে অভিভূত করেছে। এ দরদ, এ নিষ্ঠা কোথা থেকে আসে, মানুষ বলে মানুষকে ভালোবাসার প্রেরণা ছাড়া, রোগ সারানোই আমার আচরণীয় ধর্ম এ বিশ্বাস ছাড়া ? তাই, মনের উঁচু বিশ্বাস ও আদর্শের পাশে তোলা ছিল যে মানুষটি, সে যেন আজ হুড়মুড়িয়ে পড়ছে সব কিছু নিয়ে। অনুগতা ভক্তিমতী নার্স অণিমাকে খাতিরে বা স্নেহে হোক বাঁচাতে ছুটে যায় আর হর্ষ ডাক্তারের মেয়ে বলে জ্যোতি হয় বাতিল,—কথা তো শুধু তাই নয় ! কোনো অণিমা কোনো জ্যোতিই কিছু নয় ডাক্তার পালের কাছে। সে নিজেই সব—ডাক্তার সে ! তার জগতে সে আছে আর আছে তার ডাক্তারি, রোগীর স্থান সেখানে নেই ! রোগী ছাড়া রোগ হলেও সে এমনিভাবে চিকিৎসা করে যেত—রোগী গোরুছাগল কীটপতঙ্গ হলেও কিছু আসত যেত না।

রাস্তার ওধারে সাজানো গোছানো নতুন বড়ো ওষুধের দোকান, ঝকঝকে তকতকে। টেলিফোন আছে। কেদার ধীরে ধীরে দোকানে ঢোকে।

মাপ করবেন, বাইরের লোককে টেলিফোন করতে দেওয়া হয় না।

নিজের ডাক্তার পরিচয় দাখিল করলে টেলিফোন করতে দিতে আপত্তি থাকবে না, কেদার জানে। জরুরি দরকারে ডাক্তারকে টেলিফোন করবে বললেও আপত্তি তুলে নেবে। কিন্তু একটা টেলিফোন করার জন্য কোনোদিক দিয়ে কোনো ডাক্তারকে টেনে আসরে নামাতে তার বিতৃষ্ণা বোধ হয়। সে রোগীর কথা বলে।

বলে, আমার বিশেষ দরকার মশায়। রোগীর অবস্থা খারাপ —এই তো মুশকিল করে তারা, নিয়ম নেই তবু—! পয়সা লাগবে। তা তো লাগবেই ! হর্ষ ডাক্তারকে টেলিফোন করে পয়সা দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে চোখ বুলিয়ে নেয় দোকানের চারিদিকে। এ রকম সুবিন্যস্ত আলোয় ঝলমল সুশ্রী সুন্দর ওষুধের দোকান তার মনে স্বপ্নের মোহ এনে দেয়, রূপসি মেয়ের মতো দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

বাড়ি ফিরে সে একখানা চিঠি পায় ছায়ার।

## ১২

ইটের চার কোনা চোঙার তলের দিক এই উঠানটুকুতে দাঁড়িয়ে কষ্টে ওপর দিকে তাকালে ওপরের খণ্ডিত আকাশটুকুতে হালকা একরাশি মেঘ এসেছে দেখা যায়। রোদের চোঁয়ানো আলোটুকুও ম্লান হয়ে এসেছে দেখে মুখ তুলে না চেয়ে পারা যায় না, মাথার এলো খোঁপা পিঠে ঠেকিয়ে এভাবে চাইতে গিয়ে ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে মনে হলেও। এক পশলা বৃষ্টি হবে কি ? নিজের এটা সংশয় নয় ছায়ার, মনে মনে সে যেন জিজ্ঞাসা করে মেঘলা ওই আকাশটুকুকেই। সে জানে না, তার দাবিও নেই, আকাশের মেঘ খুশি হয়ে অযাচিতভাবে এক পশলা বৃষ্টি আজ দেবে কি-না মেঘই যেন তা বলতে পারে !

এমনিতেই বদ্ধঘরে আর প্রাচীর ঘেরা উঠানে তার স্থায়ী গুমোট, বাইরে বাতাস বইছে কি-না উত্তর বা দক্ষিণের, সে টেরও পায় না অনুভূতির রকম-বিরকমের মারফতে ছাড়া, ঝড়ের রূপ নিয়ে না এলে বাইরের বাতাস পৌঁছায় না তার কাছে। বাইরে গুমোট হলে সদা সক্রিয় অভ্যস্ত একটা চাপ যেন শুধু বেড়ে যায়, চলতি জ্বর বেশি হওয়ার মতো।

বৃষ্টি যদি হয়, ঠান্ডা যদি পড়ে, যন্ত্রণাটা কি তার বাড়বে ? যে যন্ত্রণাই হোক, শরীরের ঠান্ডা লেগে যন্ত্রণা বেড়ে যায়, এইটুকু ছায়া জানে। ঘুপচি রান্নাঘরের বদ্ধ হাওয়ায় তার দম আটকে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, কিন্তু কদিনের এই অসহ্য যন্ত্রণাটা যেন সত্যই একটু কম পড়ে উনানের আঁচ লাগলে।

মেয়েমানুষের কানে ব্যথা ! পেটে নয়, কানে ! বাচ্চা কাচ্চা নয়, জোয়ান বয়সি এক বিয়ানি মেয়েমানুষ, তার কানে ব্যথা। বাচ্চাদের কানে আর পেটে ব্যথা হয়, সেটা সবাই জানে, কিন্তু এই বয়সে কান ব্যথা !

সীতাংশু বলে, ময়লা জমেছে কানে। মাঝে মাঝে তেল দিতে পার না কানে দু-একফোঁটা ? না, কানটা তেলে চক্‌চক্ করলে রূপের হানি হবে ? তেল দিয়ে বাইরেটা সাবান দিয়ে ঘষে সাফ করে নিলেই হয়। দুদিনে একটা করে সাবান তো ফুরোচ্ছ,—লাটসায়েবের বাড়ি যেন !

কানের অসহ্য ব্যথার কথা এসে ঠেকে সাবানের খরচে।

আমি একা সাবান খরচ করি ? মুখে হাতে একটু মাখি তো মাখি, নইলে নয়। আমায় দায়ি করো কেন ? আমি একাই যেন তোমায় ফতুর করলাম ! বিয়ে করা বউকে লোকে কত কী দেয়, গায়ে ঘষবার সাবান জোটে না আমার। আর তুমি যে ওদিকে—

জানি, জানি জানি। নিজের রোজগারের দু-চারটে টাকা নিজের জন্য খরচ করি বলে বজ্জাত বনেছি।

বাসনের পাঁজা তুলতে গিয়ে উঁচু হতেই কানটা যেন ঝনঝনিয়ে বেড়ে ওঠে মহাসমারোহময় যন্ত্রণার ব্যান্ড বাজনার মতো ! বাসনগুলি তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছায়া ভাবে, ছুরি দিয়ে হোক, ক্ষুর দিয়ে হোক, কানটা কেটে ছেঁটে ফেলতে পারার উপায় জানলে বোধ হয় ক্ষুর দিয়ে গলাটা কেটে বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার ইচ্ছাটা এমন জোরালো হত না। স্যাঁতসেঁতে উঠানে চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মাথাটা কী তার ফেটে যাবে না—এমন ভাবে ফেটে যাবে না যাতে সঙ্গে সঙ্গে তার মরণ হয় ?

আমি বলে মরে যাচ্ছি কানের ব্যথায়—ক-দিন বারবার কেন যে সে নিরর্থক সীতাংশুকে এ কথা শোনাতে গিয়েছে সকালে বিকালে ! তার বদলে নিজেই কোনো একটা ব্যবস্থা করলে হয়তো সে রেহাই পেত এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে। কিন্তু হায়, কী ব্যবস্থা করা দরকার তাই যে সে জানে না !

তার শক্ত কোনো ব্যারাম হলে সীতাংশু যে ব্যস্ত হয় না তা নয়, কিন্তু কান ব্যথার কথাটা সে কানেও তোলে না !

সরষের তেল গরম করে দিয়ো সেরে যাবে। একটু সেঁক দিয়ো। কান ব্যথা ! কান ব্যথাটাই তোমার বড়ো হল ?

শাশুড়িও তাই বলে, গরম দুফোঁটা তেল দাও কানে, সেঁক দাও একটু, সেরে যাবে। কান ব্যথা কার না হয় বাছা ? এমন তো করে না কেউ !

ননদ খুকুর বিয়ের চেষ্টা চলছে তিন-চারবছর, প্রাণটা তার রসে টইটুম্বুর, সব কিছুর একটিমাত্র মানে সে জানে। সে বলে, আসল কথাটা বলো না বউদি ? বলো, তোমার পায়ে পড়ি। বলতে হবে আমায়। কান ব্যথার মানেটা কী ? আলসেমি লাগছে ? গা গুলোচ্ছে, বমি আসছে, শুয়ে থাকতে চাও ? তাই বলো না কেন, সোজা কথা সোজা ভাষায় ! আর কাউকে না বলো, আমায় বলো ! কান ব্যথার ছল করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দেব। তোমায় রাঁধতে হবে না, বাসন মাজতে হবে না, কোনো কাজ করতে হবে না, শুয়ে শুয়ে হাই তুলবে, আর—

উঠান-চোঙ্গার আকাশটুকুর মতো মেঘলা হয়ে আসে খুকুর মুখ, যার ভালো নাম অপরাজিতা, করুণ সুরে সে বলে, কেমন লাগে বউদি ? বলো না আমায়। বলতে হবে, বলতে হবে তোমায়।

তার কানে ব্যথা। এক অদ্ভুত অসহ্য ব্যথা, যার মাথামুণ্ডু কিছু সে নিজেও বোঝে না, শুধু মনে হয় টিপটিপ, ধপধপ, ঝিমঝিম, ঝনঝন,—এ যন্ত্রণার চেয়ে মরা ছেলেটা প্রসব করার যন্ত্রণা ছিল সুখ, আরাম।

বাইরের কড়া নাড়ার শব্দ সে শুনতে পায় কানের ব্যথার পর্দার ভেতর দিয়ে, গাঢ় কুয়াশা ভেদ করে আলো আসার মতো, বিয়ের আগে ছেলেবেলায় যেমনটি সে দেখেছিল।

পাঁচু মুখ গোমড়া করে বসে আছে সিঁড়িতে, স্কুল থেকে ফিরে আজ গুড় দিয়ে বাসি রুটি খেতে বলায় তার রাগ হয়েছে।

পাঁচু, কে ডাকছে ?

মরুক, মরুক। যা হয়ে মরুক।

গুরুজনের মতো কঠিন গম্ভীর মুখ করে ছায়া আদেশের সুরে বলে, পাঁচু, কে কড়া নাড়ছে, দেখে এসো।

মুখ বাঁকিয়ে ত্যারচা চোখে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায় পাঁচু, সুর করে বলে, বউদি গেল কই, লুকিয়ে মারে দই—

সীতাংশুর মা ধমকের সুরে হাঁক দেয়, পাঁচু !

পাঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় দোতলায়, দোতলার নতুন ভাড়াটেদের সমবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করছে—কিন্তু ভাব জমছে না কিছুতেই। প্যাকাটির মতো ছেলেগুলি নির্জীব, প্রাণহীন।

ছায়া ধৈর্য হারায়। চুপিচুপি একখানি পোস্টকার্ড লিখে দোতলায় স্কুলে-যাওযা মেয়ে আলোকে দিয়ে কাল পোস্ট করিয়েছিল, হয়তো সশরীরে জবাব এসেছে সেই চিঠির। দশটা কী বারোটার ডাকে চিঠিখানা পেয়ে হয়তো কেদার নিজেই দেখতে এসেছে তাকে চারটে বাজতে না বাজতে, শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

ছায়া নিজেই গিয়ে দরজা খোলে, বলে, এসো, ডাক্তার ঠাকুরপো, এসো।

যতটা আনন্দ ঢালা উচিত ছিল কথাগুলির মধ্যে তা অবশ্য সে ঢালতে পারে না। অসামঞ্জস্যটা লক্ষ করে কেদার। কারণ, যদিও সেদিনের পর সে আসেনি এ বাড়ি, আগে যখনই সে এসেছে ছায়ার অভ্যর্থনায় কখনও হাসির সঙ্গে এমন খাপছাড়া চাপা আর্তনাদ মিশে থাকেনি।

দুঃখ থেকেছে, কষ্ট থেকেছে, থেকেছে ম্রিয়মানতা। থেকেছে যে, সেটা সত্যিই কেদার খেয়াল করেনি আজকের আগে, সে জেনে এসেছে ওটাই হল ছায়া বউদির হাসি-ভরা অভ্যর্থনার রূপ। আজ জলো দুধের বদলে টক-ছানা-কাটা দুধের মতো একেবারে নতুন রকম তার হাসি আর অভ্যর্থনার তফাতটা সে টের পায়, টের পায় আগেও বরাবর বড়ো কষ্টে ছায়া বউদি তাকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে।

কেমন আছ ছায়া বউদি ?

তেমন ভালো নয় ডাক্তার ঠাকুরপো।

কেদার ঠাকুরপোকে ডাক্তার ঠাকুরপো করেছ ? কেদার বলে অনুযোগ দিয়ে।

করব না ? কানে বড়ো ব্যথা ঠাকুরপো, বড্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। ডাক্তার ঠাকুরপো যদি বাঁচায় আমাকে !

ছায়া বলে মরো-মরো কাঁদো-কাঁদো হতাশার সুরে, একমাত্র আশা-ভরসাকে আঁকড়ে ধরবার চরম ভাষায়।

সীতাংশুর মার গলা ভেসে আসে, কে এসেছে কে ? কেদারের গলা শুনছি ? কেদার এয়েছে নাকি ?

আমি খুড়িমা, আমি। এখুনি আসছি আশীর্বাদ নিতে, ছাতা-টাতাগুলো রাখি ঠিকমতো গুছিয়ে। কেদার বলে হাঁক দিয়ে। গলা নামিয়ে বাপের মতো, দাদার মতো, স্বামীর মতো, সেই সঙ্গে খানিকটা ডাক্তারেরও মতো সুরে জিজ্ঞেস করে, কীসের ব্যথা কানে ? কদিন হল ?

তিন-চারদিন হল। ব্যথায় মরে যাচ্ছি ঠাকুরপো, তুমি না এলে আজ—

গলায় দড়ি দিতে ?

দিতাম—

কবজি ধরে নাড়ি না দেখে, বুকে স্টেথিস্কোপ না লাগিয়ে, কোন কানে ব্যথা জানবার চেষ্টা পর্যন্ত না করে, কেদার বলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা দেবার সুরে, ভেতরে যাও, অন্য সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সীতুদা যখন আসবে, তখন চা নিয়ে এসো। তোমায় কিছু বলতে হবে না, করতে হবে না, শুধু চা দিতে সামনে আসবে।

শুনে রোমাঞ্চ হয় ছায়ার দেহে। রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে বারবার তার শুধু এই কথাটাই মনে হয় যে যুবক বয়সের গোড়ার দিকে সত্যই মানুষের মতো মানুষ থাকে মানুষ। বছরখানেক সীতাংশু যা ছিল বিয়ের পর, কোনোদিন মদ খেলে পর্যন্ত বাড়ি এসে যেমন সে করত তাকে নিয়ে তার রাগ, অভিমান, ভর্ৎসনা সব কিছু মাথা পেতে নিয়ে—সে যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়, অথচ সত্যি ঘটেছিল। স্যাসের জন্যই তাকে এত মায়া করতে পারল কেদার। দু-একবছর পরে হয়তো তাকে মরতে দেখলেও এই কেদার উদাস চোখে চেয়ে বলবে, মরছ নাকি তুমি, কী আর করা যায়, মরো !

সীতাংশু বাড়ি ফিরে বলে, আরে, আরে, কেদার যে ! কদ্দিন পরে দেখা ! কেমন আছ ? বাড়ির সব ভালো ?

কে জানে কী ভাবে এটা সম্ভব হয়। ছোটো ভাইয়ের মতোই সে ছিল বটে একদিন কিন্তু নিজে বিগড়ে যাবার পর তারই সম্পর্কে একটা উদ্ভট সন্দেহ নিজের মনে সৃষ্টি করে পাড়া ছেড়ে এ বাড়িতে পালিয়েও এসেছে সীতাংশু,—অথচ তার ভাব দেখে কে কল্পনা করতে পারবে মনে তার কিছু আছে !

ভদ্রতাটুকু সেরে, জামাকাপড় ছেড়ে সে মুখ হাত ধুতে যায়। ফিরে এসে বসে জমজমাট হয়ে। তিন হাজার মজুর কাজ করে তার কোম্পানিতে, মানে, যে কোম্পানিতে সে চাকরি করে দেড়শো টাকা বেতনে, যেখানে তেইশ থেকে একশো চল্লিশ পর্যন্ত মাইনের সত্তর-পঁচাত্তরজন চাকুরের চেয়ে বেশি মাইনের তার চাকরি !

এক কাপ চাও খাওয়াবে না সীতুদা ?

শুধু চা ? অ্যাদ্দিন পরে এসেছ ?

ভুরু কুঁচকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবে সীতাংশু, বলে, মা লুচি-টুচি তো পরে হবে, এককাপ চা দিতে বলো না আগে।

চা এনে দেয় ছায়া।

কেদার বলে, বউদি, কানে কী হয়েছে আপনার ?

এ ছলনা ভালো লাগে না ছায়ার। মনে মনে সে কোটি মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু তাকে মায়া করে তাকেই বাঁচবার জন্য এ ছলনা বলে কৃতজ্ঞতায় মনে মনে মাথা নুইয়ে সে প্রণাম করে দেওর সম্পর্কের কেদারের পায়ে।

কী জানি ! ভীষণ ব্যথা করছে কানটা কদিন ধরে। রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না, কানের ব্যথায় সময় সময় মনে হয় কী যে—

দেখি।

কেদার তখন ডাক্তার, কারও কিছু বলার বা করার অধিকার নেই। ছায়ার কানটা সে এমনি সাধারণভাবে পরীক্ষা করে। তাকে প্রশ্ন করে কয়েকটা। অতি গুরুতর বিরুদ্ধ সমালোচনাভরা মুখে তাকিয়ে সে ভড়কিয়ে দেয় সীতাংশু আর তার মাকে। শেষে ভর্ৎসনা করে বলে, সীতুদা, তিন-চারদিন হল, কোনো ব্যবস্থা করোনি ?

সীতাংশু বিব্রত হয়ে বলে, কী হয়েছে বুঝতে পারিনি ভাই।

আমিই কি পুরোপুরি বুঝতে পারছি, কেদার বলে ডাক্তারি ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে, এটুকু বুঝতে পারছি যে এটা বোধ হয় সিরিয়াস কিছু হবে।

তার মানে ?

মানে ? মিনিট খানেক কেদার ভাবে। বলে, মানে হল এই। কানে খোল জমে এ ব্যথা হয়নি। কানের হাড়ে লাগছে, সেটা ব্রেইনে সোজাসুজি টাচ করে ভীষণ পেন তুলছে, যত তাড়াতাড়ি পাবা যায় অপারেশন না করালে—

ঠাকুরপো, আমায় বাঁচাও !

পরদিনই অপারেশনের ব্যবস্থা হয়, কেদারের ব্যবস্থা।

সীতাংশু বলেছিল, বাড়িতে হয় না ?

বাড়িতে ? কেদার ধমকের সুরে বলে, মাথায় অপারেশন কবতে হবে সীতুদা, সেটা ভুলো না। দু-তিনদিন শুধু দেখে শুনে বিচার বিবেচনা কবে ঠিক করতে হবে কীভাবে কতটুকু কম ইনজুরি করে অপারেশনটা করা যায়, ডাক্তারদের যে কী ঝকমারি সীতুদা—

নাকের সামনে কী একটা ধরেছে, তা থেকে বেরিয়ে আসছে গন্ধ, আশ্চর্য গন্ধ। আশ্চর্য গন্ধ, ঘুমপাড়ানি গানের সুর যেন গন্ধ হয়েছে। এ গন্ধ শুঁকতে আরম্ভ করে প্রথমেই উৎকট একটা প্রতিবাদ জাগে, ইচ্ছা হয় দুহাতে যন্ত্রটাকে ধরে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয় দেখাই যাক না গন্ধ হয়ে এই যে নিবিড় গভীর ঘুম ঘনিয়ে আসছে, তার রূপটা কী !

ওদিকে জ্যোতি অজ্ঞান হয়ে আছে নিজে থেকেই। অপারেশন করাব জন্য তাকে আর ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হবে না।

এদিকে ছায়াকে অজ্ঞান করা হয়েছে ওষুধ দিয়ে।

জ্যোতি বাঁচবে না। ছায়া বাঁচবে, মাথা তার ঠিক আগের মতো সাফ থাকবে কি না বলা যায় না।

কেন বাঁচবে না জ্যোতি ?

কেন ভোঁতা হয়ে যাবে ছায়ার মাথা ?

পরিষ্কার ধারণা করতে পারছে না কেদার। সে ডাক্তার !

এই সব ঝঞ্ঝাটে ও মানসিক সংঘাতে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে দিন কাটে কেদারের।

কত দিকে কত মানুষের সঙ্গে মনে সংযোগ ঘটে থাকলেও দীর্ঘকাল যোগাযোগটা আর কিছুতেই ঘটে ওঠে না।

সাধ হয় পদ্ম ঝি-র খবর নিতে। সে আর ঝি নেই কেদারের কাছে। ট্রামের সেই গরিব বউটি আর পদ্ম ঝি রোগিণী হিসাবে তার কাছে একাকার হয়ে গেছে। নগেনকে একবার দেখে আসতে ইচ্ছা

হয়— কাছেই বাড়ি। ছেলেটি তার বাঁচেনি—কিন্তু নগেন যাতে আরও কিছুকাল নিজে টিকে থাকতে পারে সে জন্য তাকে কয়েকটা জরুরি উপদেশ দিয়ে আসবার অদম্য ইচ্ছা জাগে।

নগেনের মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে সুস্পষ্ট রোগের লক্ষণ—যে রোগ যক্ষ্মার মতো সংক্রামক নয় কিন্তু প্রায় সমান মারাত্মক—ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এ মৃত্যু ঠেকাবার সাধ্য নগেনের হবে না। সে জন্য যে চিকিৎসা প্রয়োজন সেটা তার কাছে আকাশ-কুসুমের মতোই দুর্লভ।

তবে মরণের দিকে এগিয়ে চলার গতিটা সে আরও অনেক মন্থর করে দিতে পারে। একটু কঠোরভাবে তার সাধ্যায়ত্ত কয়েকটা নিয়ম পালন করলেই হয়।

কিন্তু যাওয়া হয় না। উপদেশ দিয়ে এলেও নগেন বেশিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করবে কি-না সন্দেহ ! এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিরর্থক সময় নষ্ট করে লাভ কী ?

অঞ্জলির সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়। অঞ্জলি আরেকদিন নিজেই এসে হাজির হয় না কেন ভেবে অভিমান জাগে। কিন্তু দেখা আর হয় না অঞ্জলির সঙ্গে।

খবরের কাগজে শহরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাবটা পড়ে। সে জানে এ হিসাব ঠিক নয়—এ শুধু আইন মতে স্বীকৃত জন্ম-মৃত্যুর হিসাব। যে স্তরে তার প্রধানত চলাফেরা দাঁড়িয়েছে—শহরের বেশির ভাগ সাপ্তাহিক মৃত্যু সে স্তরে ঘটে না।

রোগ ও মৃত্যুর যথেচ্ছ বিহার যে স্তরে যেখানে তার যাতায়াত কদাচিৎ ঘটে।

সে বড়ো ডাক্তার নয়, তবু।

খাঁটি বস্তিবাসী দু-চারজন রোগী রোজই আসে হর্ষ ডাক্তারের ওষুধের দোকানে। ডাক্তার ডাকতে নয়—রোগের লক্ষণ মুখে বলে ওষুধ নিয়ে যেতে। কম দামি ওষুধ হলে কেউ কেনে। অন্যেরা ওষুধের দাম শুনেই ফিরে যায়।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সত্যটা কেদারের কাছে যে মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকগুলি দামি আর কতগুলি বছরের দামি সময় খরচ করে ডাক্তার হয়ে এ দেশের গরিব জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় না ডাক্তারের পক্ষে।

গরিব মানুষগুলির একমাত্র অবলম্বন ম্যাজিকওলা চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসা আর মাদুলি কবচ ঝাঁড়ফুঁক।

কেদার ভাবে, হায় ভগবান, গীতাকে বিয়ে করে ওই বিলাতে গিয়ে মস্ত ডাক্তার হয়ে আসবার স্বপ্ন দেখছি, ওই বিলাত আমার দেশটাকে রেখে দিয়েছে টোটকা আর মাদুলির চিকিৎসার স্তরে !

রাস্তার ফুটপাতে পড়ে আছে কত রোগী।

ট্রামে-বাসে চড়ে গেলেও দেখতে পাবে, ফুটপাতে পায়ে হেঁটে গেলেও দেখতে পাবে।

দেখায় শুধু তফাত হবে খানিকটা।

সকালবেলা হঠাৎ পদ্ম ঝি-র স্বামী বংশীধরের আবির্ভাবটা কেদারকে সেদিন উৎসাহিত করে তোলে।

তার আসবার সঙ্গে সঙ্গে বংশীধর তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল,—তবু।

তবু কেদার উৎসাহিত বোধ করেছে।

যে খুনিকে আয়ত্ত করার সাধ্য কারও ছিল না, কোনো আইনে যাকে পাকড়ানো যেত না, সে এসে তারই কাছে হাজির হয়েছে শুধু তার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আদর্শে বিশ্বাসটা সরলভাবে বাস্তবভাবে ঘোষণা করার জন্য।

পদ্মকে খাতির করে না বংশীধর। পদ্ম তার কাছে শুধু টাকা চায়। টাকা কয়েকটা যখন দিতে পারে তখন পদ্ম তাকে কী ভাবেই যে খাতির করে।

এবার বেশ কিছু টাকা হাতে করেই ফিরেছে, কিন্তু পদ্ম একেবারেই আমল দেয়নি। একেবারেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে পদ্ম !

আগে রোগটি সারাও, তারপর এসো।

কেদার তাকে সোজা ভাষায় যা বুঝিয়েছিল, সেই কথাগুলিই সে বংশীকে বলে। খানিকটা অবশ্য গুলিয়ে ফ্যালে।

পদ্মর উপদেশ শুনে নয়, তার চেহারাটি এবার বেশ খুলেছে দেখে এবং কোনোমতেই সে রফা করবে না টের পেয়ে বংশী কেদারের কাছে এসেছে।

এ এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে যতটুকু সে আয়ত্ত করেছে রোগ সারাবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাই দিয়েও খানিকটা উপকার করা যায় এ দেশের কিছু অজ্ঞ গরিব মানুষের !

কয়েক বছর আগে আরও কম বয়সে এইটুকু করার জন্য নেমে পড়াটাই জীবনের উপযুক্ত ব্রত বলে মনে হত কেদারের, কিন্তু সে সব দিন কেটে গেছে।

এ যুক্তির ফাঁকি কেদার জানে।

কয়েকজন গরিবের রোগ সারাল। বেশ কথা। কিন্তু তারপর ? দেশ জোড়া অসংখ্য গবিবের কি আসবে যাবে ? মানুষের দারিদ্র্য তো ঘুচে যাবে না তার চিকিৎসার সেবা-ব্রতে !

দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা না পেলে কারও একার চেষ্টায় কোনো দেশের মানুষের কোনো দুঃখই ঘুচতে পারে না।

ডাক্তারি পেশার মধ্যেও যে গলদ আর অনিয়ম, তার জন্যও কোনো ডাক্তার ব্যক্তিগতভাবে দায়ি নয়, ওটাও দেশের লোককে অন্নবস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার ফল।

চিকিৎসাও এ দেশে দামি পণ্য ছাড়া কিছুই নয়।

যে দেশে না খেয়ে মানুষ মরে সে দেশে রোগ হলে কি চিকিৎসা পাবার অধিকার থাকে মানুষের ?

এই অবস্থাতেই যদি থাকে দেশ, জগৎ ঘুরে যত পারে জ্ঞান সঞ্চয় কবে নিয়ে এসে মস্ত ডাক্তার হয়ে হাজার সদিচ্ছা নিয়েও কিছুই সে করতে পারবে না দেশের লোকের।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারবে না।

কারণ, ডাক্তারি করে তো তার সাধ্য হবে না দেশের অবস্থা পালটে দেবার।

শুধু ডাক্তারি করলে তার চলবে না।

কেবল বড়ো ডাক্তার হয়ে তার সাধ মিটবে না।

ডাক্তার বলেই সে রেহাই পায়নি। দেশের অবস্থা বদলে দেবার জন্যও তাকে মাথা ঘামাতে হবে, সময় ও শক্তি দিতে হবে।

কিন্তু আরও জ্ঞান যে তার চাই ? ডাক্তার হিসাবেও তার যে আত্মবিশ্বাস দরকার রোগীর প্রাণ বাঁচাতে, তার দেশের মানুষ খাঁটি স্বাধীনতা অর্জন করলে চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা গড়তে—নতুন রকম ডাক্তার তৈরি করা থেকে চিকিৎসাকে জল বাতাস রোদের মতো সুপ্রাপ্য করতে ?

নিজের জীবনের সংকটটা আজ জানতে পেরেছে কেদার।

জ্যোতি কেন মরবে আর ছায়া কেন হাবা হয়ে যাবে এ প্রশ্নকে বাতিল করে যেমন আছে সে রকম ডাক্তার হয়ে থাকলে তার চলবে না।

আবার জ্যোতির মৃত্যু ও ছায়ার মাথা বাঁচাবার ক্ষমতা অর্জন করতে দ্বিতীয় ডাক্তার পাল হলেও তার চলবে না।

অল্পবিদ্যার ডাক্তার অথবা দেশকে বাতিল করা বড়ো ডাক্তার হওয়া তার জীবনে অর্থহীন।

দামি একটি মোটর এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। ড্রাইভারের হাতে একটি ছোটো চিঠি দিয়ে অঞ্জলি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কোনো কারণ জানায়নি।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেও কারণ কিছু জানা যায় না। সে শুধু জানায় যে অঞ্জলির তেমন কোনো অসুখ হয়েছে কি-না বলতে পারে না, তেমন কোনো অসুখ হলে সে অবশ্যই জানতে পারত, তবে কিছুদিন থেকে অঞ্জলি একেবারেই বাড়ি থেকে বেরোয় না।

আহ্বানটা জরুরি নিশ্চয়। নইলে ডাকেও অঞ্জলি চিঠি পাঠাতে পারত। এই গাড়িতেই যাওয়া উচিত মনে হয় কেদারের।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকেই দেখা হয় অনাদির সঙ্গে। অনাদি বোধ হয় তার সেদিনের সেই সমালোচনা ভুলতে পারেনি। অত্যন্ত প্রাণহীন নীরস হয় তার অভ্যর্থনা।

কেদার অবশ্য সমালোচনা করার ভাষায় কিছুই বলেনি তাকে—কিন্তু অনাদির নিজের মনেও তো খুঁতখুঁতানি না থেকে পারে না। টাকার জন্য সে বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে দিচ্ছে—এ রকম স্পষ্ট অনুযোগ না করলেও কেদার তো তাকে বলেছে যে চেষ্টা করে সে খুব বড়ো বৈজ্ঞানিক হতে পারত, দেশের লোক অনেক আশা করে তার কাছে। তার মানেই দাঁড়ায় তাই।

কেদার ভদ্রতা করেই জিজ্ঞাসা করে, চাকরিতে জয়েন করেছেন ?

তাতে যেন চটে যায় অনাদি !—করেছি।

...ত্যা কেদার বলে, অঞ্জলি একটু ডেকেছিল আমায়। ওর কোনো অসুখ হয়নি তো ?

অনাদি বলে, অসুখ কি-না আপনারাই জানেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে নাকি এর কোনো প্রতিকার নেই। কাজেই অসুখ বলে না মেনে উড়িয়েও দিতে পারেন !

কী হয়েছে ?

শ্বেতি হয়েছে। মুখে।

অঞ্জলির আঁকা ছবির মতো সুন্দর মুখখানা স্মরণ করেই কেদার বলে, কী সর্বনাশ !

অনাদি বলে, কী করতে আছেন মশায় আপনারা ? কত বড়ো বড়ো স্পেশালিস্ট, কত নাম ডাক—সামান্য একটা স্কিন ডিজিজ সারাতে পারেন না ?

কেদার হেসে বলে, এটা কি বৈজ্ঞানিকের মতো ক... হল ডক্টর সেন ? এখনও অনেক কিছু আবিষ্কার হয়নি বলে আপনি দাযি করছেন বৈজ্ঞানিককে ?

অনাদি লজ্জিত হয়ে বলে, না না, ও ভাবে বলিনি কথাটা। আমি বলছিলাম কী সায়ান্সে প্রগ্রেসের তুলনায় আপনাদের ব্রাঞ্চটা পিছিয়ে আছে।

এটাও কি ঠিক বললেন ? কোনো রোগেই মানুষের আর মরবার বা বেশি ভুগবার দরকার নেই—আমাদের ব্রাঞ্চ আজ এ ঘোষণা করতে পারে। আপনাদের ব্রাঞ্চে মানুষ-মারা অস্ত্র বানায়—যুদ্ধকে ভীষণ করে দেয়। আমরা আহতদের বাঁচাই।

অঞ্জলি বলে, দেখছেন ? মুখখানা কেমন সুন্দর হয়েছে ?

কেদার বলে, এই কি প্রথম আরম্ভ হল ? অন্য কোথাও- ?

অঞ্জলি মাথা নাড়ে।

কেদার বলে, তুমিই সেদিন বলেছিলে, রূপের জন্য তোমার আর মাথাব্যথা নেই। নিজের রূপের মোহ কাটিয়ে উঠেছ।

অঞ্জলি বলে, তাই বলে কি কুৎসিত হতে চেয়েছি ? মুখটা আরও সুন্দর হয়ে চলবে—এই তো সবে আরম্ভ !

খুব ভড়কে গেছ ?

গেছি বইকী। বাড়ি থেকে বেরোতে পারি না। মনকে কত বুঝাই, কিন্তু লোকে এই মুখ দেখবে ভাবলে শরীর অবশ হয়ে আসে।

কেদার তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিন্তু আমাকে তো অনায়াসে দেখালে ? বিশেষ লজ্জাও পাচ্ছ মনে হচ্ছে না ?

অঞ্জলি বলে, আপনি যে ডাক্তার। আপনার কথা আলাদা। আপনি জানেন এটা কোনো খারাপ ব্যারাম নয়। কিন্তু অন্যেরা ঘেন্না করবে। অনেকে ভাববে এটা এক রকমের কুষ্ঠ হয়েছে। আমিও আগে তাই ভাবতাম !

কেদার চুপ করে থাকে।

অঞ্জলি বলে, আচ্ছা, এটার চিকিৎসা নেই। আমার যে এত বিশ্রী লাগছে, পাঁচজনের সামনে বেরোতে মনে জোর পাচ্ছি না—এর যদি চিকিৎসা থাকত ! আপনারা— ডাক্তাররা যদি আমার কাছে এটাকে আব লোকে কী ভাববে, সে ভাবনা তুচ্ছ করে দিতে পারতেন !

কেদার সহজ শান্তভাবে বলে, ও জন্য ডাক্তারের দরকার হবে না, তোমার মনের কোনো রোগ হয়নি—সে রোগের চিকিৎসাও ডাক্তার জানে। বন্ধু বলে আমায় ডেকেছ, আমিই তোমাকে ভরসা দিয়ে যেতে পারব মনে হচ্ছে। কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে ?

নিশ্চয় ! অন্য সাধারণ মেয়ের এ রকম হলে এতটা ফ্যাসাদ হত না, তুমি বেশি রকম সুন্দরী ছিলে কি না, তুমি তাই বেশি রকম বিব্রত হয়ে পড়েছ। কিন্তু তোমারও সয়ে যাবে। এটা তুচ্ছ হয়ে না যাক, অভ্যাস হয়ে যাবে, বেশি আর পীড়ন করবে না। মাঝে মাঝে হয়তো খুব কষ্ট হবে —কিন্তু সাধারণভাবে একরকম ভুলেই থাকবে। বাইরেও বেরোবে, দশজনের সঙ্গে মেলামেশাও করবে, নিজের একটা জীবনও গড়ে তুলবে।

ঠিক তো ?

ঠিক বইকী। দেশের লোকের কথা যদি ভাবতে আরম্ভ করো, চিকিৎসা করলেই সেরে যায় তবু কত হাজার হাজার মানুষ রোগে ভুগে মরছে আর পঙ্গু হয়ে আছে খেয়াল করো, মনে হবে, দূর, আমার তো কিছুই হয়নি ! যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর কত মানুষকে যে কানা খোঁড়া হয়ে, বীভৎস বিকৃত শরীর নিয়ে জীবন কাটাতে হয় যদি ভাব—

অঞ্জলি মন দিয়ে শুনে যায়। যাদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের দরদ জাগার ফলে ডাক্তার কেদার গীতাকে পাবার এবং ডাক্তার পাল হবার সুযোগ নিতে ইতস্তত করেছে, ডাক্তারি জীবনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাই যে বিরাট রুগ্‌ণ জীর্ণ আহত মানবতার দিকে মনটাকে তার ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে এনেছে শুধু নিজে বড়ো হবার স্বপ্ন থেকে, তাদের কথা বেশ খানিকটা আবেগের সঙ্গেই বলে বইকী কেদার !

যদি ডাক্তার হতে, নিজে যদি দেখতে ব্যাপারটা, তুমি নিজেই ভাবতে তোমার কিছুই হয়নি !

অঞ্জলি বলে, এখন দেখছি, বড়ো বড়ো ডাক্তার দেখানোর বদলে আগে আপনাকে ডাকলেই ভালো হত !

কেদার খুশি হয়ে বলে, বললাম না, ডাক্তারের চেয়ে বন্ধু তোমার বেশি কাজে লাগবে !

অঞ্জলি বলে, আপনি সত্যি আমার মনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কী ঠিক করলাম জানেন ? ডাক্তারি পড়ব।

গীতা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কেদার এসেছে শুনে তার বুক কেঁপে যায়।

কেদার হয়তো তাকে হার মানাতে এসেছে !

কেদারের মুখ দেখে সে চমকে ওঠে।—কী হয়েছে? শিগগির বলো।

কেদার শান্তভাবে বলে, তোমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তারপর আমি কী ঠিক করেছি জানাব। বড়ো আমি হব—তোমার বাবার চেয়েও বড়ো ডাক্তার হব। কিন্তু দেশের জন্য যদি কোনো দিন পথের ভিখারি হওয়া দরকার পড়ে, আপত্তি করবে না তো?

গীতা বলে, দেশের জন্য? এ কথা আমায় জিজ্ঞেস করছ? সব ছেড়ে দিয়ে আজ তুমি দেশের কাজে নামো—আমি তোমার সঙ্গে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

কেদার বলে, অতটা পারব না। ঝোঁকের মাথায় ডিগবাজি খেয়ে লাভ নেই। কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পেরেছি, শুধু ডাক্তার হলে আমার চলবে না। মানে, কিছু মনে কোরো না, ঠিক তোমার বাবার মতো হতে আমি পারব না।

গীতা বলে, বাবার চেয়ে বড়ো হতে পারে এমন অনেককে ছেড়ে আমি তোমায় পছন্দ করেছি ভুলে গেছ?

কেদার তার হাত চেপে ধরে।

বলে, আমি মন স্থির করেছি গীতু। বড়ো ডাক্তার হব আমি—যত বড়ো হতে পারি। জগতে যেখানে যত জ্ঞান আছে কুড়িয়ে আনব। শুধু বিলেত নয়, আমি সোভিয়েটে যাব, চীনে যাব। দেশে ফিরে এত বড়ো ডাক্তার আমাকে হতে হবে, এত প্রভাব অর্জন করতে হবে যাতে করতে চাইলে সত্যি কিছু করার সাধ্য হয়।

গীতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে—বাঁচলাম।

কেদার বলে, আমি ভাবতাম যেটুকু শিখেছি এই পিছানো গরিব দেশে তাই নিয়ে কাজে নামাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখছি আমার ভুল হয়েছিল। আমি যা করতে চাই তার জন্য যত শেখার আছে আমাকে শিখতে হবে। পিছানো দেশ বলে শিক্ষাতেও পিছিয়ে থাকলে আমার চলবে না।

গীতার মুখে হাসি ফোটে।

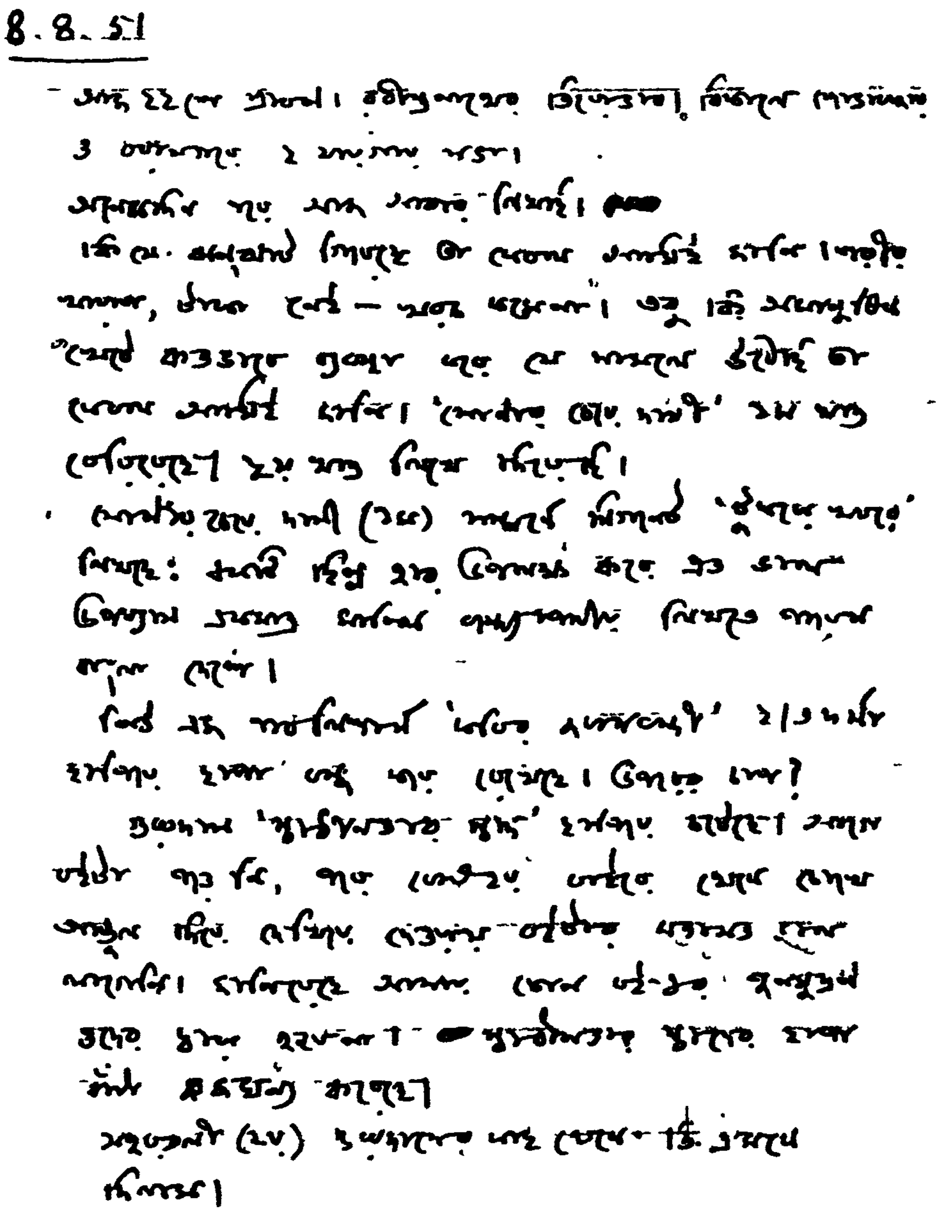
৪.৪.৫১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব ডাযেবিব একটি পৃষ্ঠাব অংশ